দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ১ম সংখ্যা ❖ ১৭ মে ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ভারত পাক যুদ্ধ বিরতি ৩
- এলোমেলো কথা ভারতের বিদেশনীতি কী হবে ট্রাম্প ঠিক করে দেবেন ? ৪
- সেক্যুলার সংবিধান ও সাম্প্রদায়িক সংলাপ ৫
- জাতি গণনার নীতি ও রাজনীতি ৭
- ''আদিবাসীদের হত্যা করার পর আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা নাচে'' — সোনি সোরি। ৯
- সত্যজিৎ রায় : এক অনন্য শিল্পীর পাঁচালী ১৩
- 'দূষণ-মূল্য' ব্যবহার করে কি জলবায়ু সঙ্কটের সমাধান সম্ভব ১৭
- জাতগণনা ইস্যুতে রাহুলের দাবীর কাছে মাথা নত করল মোদী সরকার ২০
- নাগরিকস্মৃতিচারণা শুভ জন্মদিন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪) ২১
- জঙ্গি সন্ত্রাস , সাম্প্রদায়িকতা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের শান্তি মিছিল ২৩
- শিক্ষকদের অমানুষিক লাঠিপেটা পুলিশের ২৪
- সুপ্রিম কোর্টের রাজ্য সরকারকে আগে বকেয়া মেটানোর নির্দেশ ২৫
- কাছারের ভাষাআন্দোলন ও কলকাতায় উনিশে মে ২৬
- মেধাবী ছাত্রী সৃজনীর বিরল দৃষ্টান্তস্থাপন ২৭

➲সম্পাদকীয়

যুদ্ধের উন্মাদনা দুই দেশকে বজায় রাখতে হবে

কাশ্মীরের পহেলগাঁও -এর বৈসরন উপত্যকায় গত ২২ এপ্রিল জঙ্গিহানায় অন্তত ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়। এই সন্ত্রাসবাদীরা পর্যটকদের ধর্ম সম্পর্কে জেনে হত্যা করছিল। একজন সহিস সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে পর্যটকদের রক্ষা করতে গেলে তাঁকেও জঙ্গিরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। এই সময় ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থলে কোনও সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিত ছিলনা। এর পর ওই বিপন্ন আহত ও পর্যটকদের উপস্থিত সহিসরা পিঠে করে ও ঘোড়ায় চাপিয়ে পহেলগাঁওতে নিয়ে আসেন। পহেলগাঁও ও শ্রীনগরে আপামর জনসাধারণ সমস্ত পর্যটকদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সাম্প্রতিককালের এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ একটি অন্যতম ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ঘটনা। এই ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু পর্যটকদের ওপর এই হামলা করে ভারতে ভয়ঙ্কর হিন্দু পুনরুত্থান ঘটানো , যাতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। কিন্তু তাদের এই কৌশল ব্যর্থ হয়। এর মূল কারণ সমগ্র কাশ্মীরের জনসাধারণ একজোট হয়ে রাস্তায় নেমে ঘোষণা করেন তাঁরা প্রথমে হিন্দুস্তানি, তাঁর পর কাশ্মীরি। সমস্ত পর্যটকরা তাঁদের আত্মীয়। গোটা কাশ্মীরে মোমবাতি মিছিল হয় ।

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত আক্রমণে নামে ৬ মে মধ্যরাতে। বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি এবং সেনাবাহিনীর দুই মুখপাত্র সোফিয়া কুরেশি ও ভমিকা সিংহ বলেন ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। তাঁরা জানান ভারতের লক্ষ্য জঙ্গি ও তাদের ঘাঁটি । কিন্তু শাসকদলের চেলাচামুন্ডা এবং ভারতবর্ষের গদি মিডিয়া ফেক নিউজের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধোন্মাদনায় গোটা দেশকে মাতিয়ে তোলে । সঙ্গে চলল ধর্ম ঘৃণার বিষাক্ত উদগীরণ। সেনাবাহিনীর ওপর তৈরি করা হয় পুরোদস্তুর যুদ্ধ করে একটা দেশকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার মতো আকাঙ্খার এক ভয়ঙ্কর এবং অসম্ভব চাপ। তারপর আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি নিয়ে কেটে গেল রুদ্ধশ্বাস চারটি দিন। তখন মিডিয়ার উন্মাদনা দেখে কে ! ভুয়ো সংবাদ পরিবেশনায় যেন প্রতিযোগিতা শুরু হল। পাকিস্থানের কত নগর, বন্দর, বিমানপোত যে ধুলিস্যাৎ হল তার ইয়াত্তা নেই! সে দেশের সেনাপ্রধান গ্রেফতার থেকে শুরু করে, দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি। পাকিস্তানি মিডিয়াও পিছিয়ে থাকেনি ।এরা সারা পৃথিবীর কাছে হাস্যাস্পদ হয় ।

১০ মে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এক্স হ্যান্ডেলে (ট্যুইটার) ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাঁর টিমের মধ্যস্থতায় ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ট্রাম্পকে এই মধ্যস্থতা করার জন্য ধন্যবাদ জানায়। ১০ মে বেলায় হঠাৎ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় বিদেশ সচিব একটি কয়েক মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

করেন যে ১০ মে দুপুর ৩৩৫ মিনিটে পাক সেনার ডিজিএমও ভারতীয় সেনার ডিজিএমও-কে ফোন করে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন এবং ভারত তা মেনে নেয়। দু'পক্ষ বিকেল পাঁচটা থেকে একে অপরের বিরুদ্ধে সমস্ত সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখবে বলে ঐকমত্য হয়। দেশের মানুষের একটা বড়ো অংশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন যে দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে না। সাধারণ জনজীবন আর ব্যাহত হবে না।

এই যুদ্ধ বিরতিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে।ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করার আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানান যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাঁর টিমের মধ্যস্থতায় ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়েছে। পাকিস্তান সরকার ট্রাম্পকে এই মধ্যস্থতা করার জন্য ধন্যবাদ জানায়। এখানেই প্রাথমিক প্রশ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ না দিলে কি পাকিস্তান বলা মাত্র ভারত

যুদ্ধবিরতি করল? তাহলে তো সেটা ভারতের বহু আগে গৃহীত আন্তর্জাতিক অবস্থানের পরিপন্থী। ভারত বরাবর বলে এসেছে যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনো তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ ভারত মানবে না।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে সই হওয়া শিমলা চুক্তিতে দুই দেশ এই প্রশ্নে সহমতও হয়। তাহলে এখন ২০২৫ সালে কেনো মার্কিন হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হল? কিভাবে ট্রাম্প দুই দেশের সরকারী ঘোষণার আগেই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে পারলেন? যুদ্ধবিরতির পরে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করেননি। বলেছেন যে পাকিস্তান প্রবল সামরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কাঁদছিল যুদ্ধ বিরতির জন্য। তারপরে পাকিস্তানের ডিজিএমও ফোন করেন ইত্যাদি। তাই ভারত রাজি হল (পড়ুন দুঃখে গলে গেল) ।যদি তাই হয়, তাহলে ট্রাম্প কি মিথ্যা বলছেন? বললে কেন বলছেন?

এর কোনো উত্তর মোদী দেননি। ট্রাম্পের কথাও সরাসরি নাকচ করা হয়নি। কিন্তু কেন? ট্রাম্প এই একটি ট্যুইট করে ক্ষান্ত হননি। তিনি ক্রমাগত কৃতিত্ব দাবি করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে বলেছেন তিনি যুদ্ধ থামিয়েছেন, তা না হলে নাকি কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণ যেত। তিনি এও বলেছেন যে তিনি ভারত ও পাকিস্তানকে বাণিজ্যের গাজর দেখিয়ে যুদ্ধ থামিয়েছেন। সৌদি আরবে গিয়েও তিনি একই কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বিদেশ সচিব বলছেন যে কোনো একটি নিরপেক্ষ জায়গায় ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর সহ অন্যান্য সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসবে ! এই দাবিতো কাশ্মীর প্রসঙ্গে কয়েক দশকের ভারতীয় নীতির বিপরীত। ওদের এই সমস্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর কোনও বক্তব্য নেই। কেন? মোদীর এত বন্ধু ট্রাম্প এই সমস্ত কথা বলছেন কেন? কেনো ট্রাম্প প্রশাসন সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে এক আসনে রেখে বিচার করছে । মার্কিন সমর্থনে জ্জধষ্ক বিশাল ঋণ দিলো পাকিস্তানকে । ট্রাম্প চোটে যাবে বলে মোদীর সরকার পাকিস্তানকে এই ঋণ দানের কোনও বিরোধিতা করেনি। ওই অর্থে পাকিস্তান আমেরিকা ও চিন থেকে যুদ্ধাস্ত্র কিনবে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে পরিপূর্ণ মদত দিয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু ভারত তার বক্তব্য সর্বদা জোর দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলা এবং পাকিস্তানের উগ্রপন্থাকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার ফলে আমেরিকা আর ভারত পাকিস্তান শধদ্বয়কে এক সঙ্গে ব্যবহার করত না। রাষ্ট্রপতি ওবামা, মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে মুম্বাই উগ্রপন্থী হামলার জন্য পাকিস্তানের নিন্দা করেন, সমালোচনা করেন। কিন্তু ট্রাম্প বর্তমানে পাকিস্তান মদতপুষ্ট উগ্রপন্থা নিয়ে একটি শধও ব্যয় করেননি।দুই দেশের নাম এক সারিতে রেখে উচ্চারণ করেন। পাকিস্তান একটি উগ্রপন্থার কারখানা - ভারতের এই অবস্থানের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসন সহমত নয়। দুই দেশের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করে না। তারা বারবার যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দাবি করে ভারতকে আরও বেশি অস্বস্তিতে ফেলছেন।

ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে ট্রাম্প অ্যাপেল কোম্পানির মালিককে বলেছেন ভারতে তাদের কারখানা না খুলতে। বোঝাই যাচ্ছে যে ট্রাম্প ও মার্কিন প্রশাসন ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন? এর উত্তর ভারত সরকারকে ভাবতে হবে। জনগণকে বলতে হবে কেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যের সঙ্গে ট্রাম্পের বক্তব্যের এতটা ফারাক।

ট্রাম্পের নির্দেশে হোল যুদ্ধবিরতি , এদিকে অন্ধ ভক্তকূল যাঁরা টিভির পর্দায় ভুয়ো খবর দেখে তৃপ্তি নিচ্ছিলেন তাঁরা এহেন বিনোদনে আচমকা ছেদ পড়ল দেখে ক্ষেপে গিয়ে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি এবং সঙ্গে সোফিয়া ও ভোমিকাকে প্রবল গালিগালাজ করতে শুরু করে দিল। বিক্রমের অপরাধ এই সংঘর্ষ বিরতির কথা তিনিই ঘোষণা করেছিলেন। আর নারী দুটির অপরাধ প্রথমত তাঁরা প্রথমদিনই সেনার পক্ষ থেকে সাম্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন আর দ্বিতীয়ত সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণার সময় বিক্রমের পাশেই ছিলেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ট্রোলিং বা ঘৃণাভাষণ এমন পর্যায়ে গেল যে বিদেশ সচিবকে তাঁর সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিতে হল, তাঁর মেয়েকেও ছাড়ল না এই উন্মাদরা। ধর্ষণের হুমকি অবধি দেওয়া হল তাকে। সোফিয়া ও ভোমিকাও শিকার হলেন এই ঘৃণা ভাষণের। সোফিয়াকে মধ্যপ্রদেশ বিজেপির এক মন্ত্রী ' পাকিস্তানীদের বেহেন ' বলে সম্বোধন করল। আর পহেলগাঁওয়ের ঘটনায় নিহত নৌ সেনা অফিসারের স্ত্রী হিমাংশী নারওয়াল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন বলে তাঁকেও যে ভাষায় আক্রমণ করা হল তা সভ্য সমাজে প্রকাশ করার নয়। আশ্চর্য বিষয় হল এই উন্মাদদের বিরুদ্ধে একটি কথাও মোদী, শাহরা বলছেন না। পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করছেন যুদ্ধ আর ধর্মঘৃণার পক্ষে। কিন্তু ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাবার সাহস নেই।

অথচ যুদ্ধ কোনও বিনোদন নয় যে সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হবে। প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে এঁদের উদ্দেশে বলেছেন 'যুদ্ধ কোনও রোমাঞ্চকর বলিউডি ফিল্ম নয়, যুদ্ধ-ক্ষতর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা বহন করে। এ হল একেবারে শেষ অস্ত্র, একমাত্র দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেই যুদ্ধে যাওয়া যায়।'

এদিকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে এখন থেকে ভারত আর উগ্রপন্থা-উগ্রপন্থী এবং উগ্রপন্থীদের মদতকারী দেশের মধ্যে কোনো ফারাক করবে না। অর্থাৎ আবার যদি পাক উগ্রপন্থীরা ভারতের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারে। এই নীতি স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণপন্থীদের চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে ঘোষিত হয়েছে, যারা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হওয়ার পরে দেশের বিদেশ সচিব ও তার পরিবারকে গালাগাল করতে পিছপা হয়নি। এদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে মোদী পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও সন্ত্রাস ছাড়া ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনও বিষয়ে আলোচনা হবেনা সে কথাও বলেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ভারত পাক যুদ্ধ বিরতি

সৌর বসু

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁও- এর নিকটবর্তী বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের গুলিতে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন ঘোড়সওয়ার নিহত হয়েছেন। এই হামলার চরিত্রটি অভিনব। হামলাকারী জঙ্গিরা বেছে বেছে পুরুষদের হত্যা করেছে এবং হত্যার আগে ধর্মের পরিচয় জানতে চেয়েছে। এভাবে ধর্মীয় পরিচয় জেনে হত্যার ঘটনা কাশ্মীরে ইতিপূর্বে ঘটেছে এমন কোনও তথ্য জানা যায়নি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ জঙ্গিদের কাছে খবর ছিল ভারতের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নিরাপত্তা কমিটির পরিবারের সদস্যদের ওই দিন পহেলগাঁও ভ্রমণের কর্মসূচি ছিল। উগ্রপন্থী জঙ্গিরা কী সেই কারণেই পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে তাদের হত্যা করেছে ? হতে পারে।

২০১৯ সালে ভারতবর্ষের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের থেকে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত করে । ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে সর্বদা প্রচার করে বেড়ান । কিন্তু সেই দেশে একটি অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভেঙে দিয়ে উল্লিখিত অঞ্চলকে দুটি ইউনিয়ন টেরিটেরিতে পরিণত করতে মোদিজী এবং তার দলের বিধানসভার সদস্যদের কোনো বিবেক দংশন হয়নি। বরং এই অগনতান্ত্রিক পদক্ষেপ কে ভারতের গদি মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করে হিন্দু জন মানসে ধর্মীয় বিভাজনের বীজ রোপনের কাজ সম্পন্ন করে ভারতীয় জনতা পার্টি। এরপর কাশ্মীরের জনগণের ক্ষোভ দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় মিলিটারি শাসন কায়েম করা হয়। উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হয় কবরস্থানের শান্তি। নরেন্দ্র মোদি সরকারের কাছে যা স্বাভাবিকতা ।

সম্প্রতি কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৩৫ লক্ষের বেশি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে কাশ্মীরের জনবিন্যাস দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে । কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে কাশ্মীর উপত্যকাকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত করতে।

২২ এপ্রিল পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের পর দু সপ্তাহের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু কোনো হত্যাকারী ধরা পড়েনি। ভারত সরকারের অভিযোগ জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট। যদিও তার কোন প্রমাণ অবশ্য এখনো অবধি মোদীজির সরকার পেশ করতে পারেনি। জঙ্গিদের কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়নি। আরেকটি ঘটনাও তাৎপর্যপূর্ণ। জনৈক পর্যটকের বয়ান অনুযায়ী জঙ্গিরা তার কাছ থেকে ইসলামিক কালেমা জানতে চায়। কাশ্মীরে বড় হওয়া পর্যটকটি ইসলামিক কালেমা পাঠ করতে সমর্থ হওয়ায় , হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা করা হয়নি ।

এই হত্যাকাণ্ডের দায় ভারত সরকার পাকিস্তানের উপর চাপালে, পাকিস্তান তা অস্বীকার করেছে। জঙ্গি হামলার কয়েকদিন পরে পহেলগাঁও অঞ্চলে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কোনও প্রমাণ ছাড়া এই ঘটনা অনভিপ্রেত । ২০১৪ সালের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতে ধর্মীয় মেরুকরণ শুরু হয়ে যায়। বিগত বছরেও সংখ্যালঘুদের প্রায় ৭ হাজার ৪০০ টি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং ১৬ টি রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার সংখ্যালঘু গৃহহীন হয়ে পড়ে। কাশ্মীর উপত্যকার সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পর শ্রীনগর জুড়ে উপত্যকার জনগণ বন্ধের ডাক দেয় এবং পহেলগাও হত্যালীলার তীব্র প্রতিবাদ করে । শুধু তাই নয় উগ্রপন্থী হামলার পর বিভ্রান্ত পর্যটকদের সাহায্য করার জন্য কাশ্মীরের জনগণ এবং হোটেল ব্যবসায়ীরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে।। পর্যটকদের জন্য রাতের আশ্রয় এবং খাবারের ব্যবস্থা করে। নিজেদের উদ্যোগে পর্যটকদের এয়ারপোর্ট অথবা বাস স্টেশনে পৌঁছে দেয়। ওদিকে বিশাল ব্যবসায়ী এয়ারলাইনস কোম্পানির মালিকরা সুযোগ বুঝে শ্রীনগর থেকে দিল্লী ফেরার প্লেন ভাড়া নিয়েছে ৪০/ ৫০ হাজার টাকা করে। কলকাতা হলে আরো বেশি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, হিন্দুত্ববাদীরা দেশপ্রেমের ধূয়ো তুলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা থেকে বিরত হয়নি। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত ইন্ডিয়ান নেভি'র লেফটেন্যান্ট-এর স্ত্রী হিমাংশি নারওয়াল হত্যাকারীদের কড়া শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই উগ্রপন্থী হানা, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যেন বিভেদ সৃষ্টি না করে। কাশ্মীরের মুসলমানদের প্রতি যেন কোনও অবিচার না হয। এই বিবৃতি দেওয়ার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করে, অনলাইনে হয়রানি করে।

পহেলগাঁও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে ফেলা হবে। জঙ্গি হামলার ঘটনার ফলশ্রুতিতে শুরু হয়ে যায় অপারেশন সিঁদুর। এই নামকরণের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হল। সকলকে চমকে দিয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি মেনে নিল। ভারতের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি লংঘন করলে ভারতের পক্ষ থেকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরপরেও উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হলো এবং সাময়িকভাবে শেষও হল। সাময়িক কারণ পুনরায় যুদ্ধ যে শুরু হবে না এই আশ্বাস কে দিতে পারে। এই যুদ্ধ আমাদের সামনে কতকগুলো প্রশ্ন হাজির করে দিয়েছে । এই যুদ্ধ কি কাশ্মীর উপত্যকায় স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবে ? এই যুদ্ধ কি মুছে ফেলতে পারবে কাশ্মীর উপত্যকার সন্ত্রাসবাদী আতঙ্ক ? যে সমস্ত জঙ্গি শিবির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত, পাকিস্তান আক্রমণ করেছিল সেই শিবিরগুলির বর্তমান অবস্থা কি ? ভারত সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার শৈথিল্যের কারণে, যে নিরপরাধ মানুষগুলি জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারালো তার তদন্তের কি হবে ?

বিগত ২৫-৩০ বছরে কাশ্মীর উপত্যকায় অনেকগুলি সন্ত্রাসবাদী হানা হয়েছে। তার ফলশ্রুতিতে দুটো দেশের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে। অনেক প্রাণ নিভে গেছে। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসে নি। ২০১৯ সালে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ তুলে নেবার পর নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে কাশ্মীরের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কাশ্মীরে শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু পহেলগাঁও - এ সন্ত্রাসবাদী হানা, তার সেই সদম্ভ ঘোষণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে।

বর্তমানে পৃথিবীর জুড়ে এক অরাজক অবস্থা চলছে।আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর তার স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের ফলে ইউরোপ এশিয়ার দেশগুলি অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনদের নির্বিকার হত্যাকাণ্ডে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে ইরান সিরিয়া লেবানন প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি জড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধ। এর প্রভাব এসে পড়েছে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে। এর মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংকটের মুখে পড়তে পারে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য ব্যবস্থা একটি বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে। এই অবস্থায় ভারত থেকে বিদেশি পুঁজি মুখ ফিরিয়ে নিলে, ভারত অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হবে। বিদেশি বিনিয়োগ বাধা প্রাপ্ত হবে।

পহেলগাঁও - এর ঘটনা এবং কদিনের যুদ্ধ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রনিক এবং সামাজিক মাধ্যমে কিভাবে ক্রমাগত ভুল এবং অসত্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে। ভারত সরকারের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যমের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং প্রতিহিংসা পরায়নতা সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে।

যুদ্ধ বিরতি যাতে স্থায়ী হয় অর্থাৎ পুনরায় যাতে যুদ্ধ শুরু না হয় সে ব্যাপারে দুটো দেশকেই সতর্ক থাকতে হবে ।মনে রাখতে হবে দুটো দেশই পরমাণু শক্তিধর। সে কারণে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হলে তার পরিণতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

এলোমেলো কথা

ভারতের বিদেশনীতি কী হবে ট্রাম্প ঠিক করে দেবেন ?

শুভ বসু

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজির চেয়ে এককাঠি সরেস হলো ভারতের গদি মিডিয়া। সেই পুরোনো কবিতার লাইন 'বাবু যত বলে পারিষদ দল বলে তার শতগুন।' আসলে মোদীজি , রাজনাথজি সবাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর ধমক খেয়ে ক্ষাত্রতেজ সম্বরণ করেছেন। কিন্তু গর্জন করে যেতে হবে , তাই তাঁরা গর্জন করার দায়িত্ব দিয়েছেন অন্ধ ভক্তকুলকে। আর তার নানারকম প্রতিধ্বনি তুলছেন অর্ণব এবং তাঁর দলবল। কিন্তু বাংলা ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত কোণঠাসা রাজ্য। তাই এখানে আরো গর্জন করেন ময়ূখ, সুমন প্রভৃতি তথাকথিত সাংবাদিকরা । রণক্ষেত্র থেকে দূরে বসে এরা শুধু ঘ্যাঁঘাসুরের মতো চেচান। ভিতরে ভিতরে কিন্তু সংকট।

আসলে ভারতের ভবিষ্যৎ বিদেশ নীতি কি হবে সেই নিয়ে কোনও দিশা সরকারের নেই। চীনের সঙ্গে কি সম্পর্ক হবে ? রাশিয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক হবে? একটি মাল্টিপোলার বা বহু মেরুর বিশ্বে ভারত কি করে তার স্বাধীন বিদেশ নীতি বজায় রাখবে সেটাই হলো আসল প্রশ্ন। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হলো, পাকিস্তান কে ধমক দেয়া হলো, এবার পাকিস্তান পাল্টা ধমক দিলো , কিন্তু এর পরে ভবিষ্যৎ কি ? মনে রাখবেন ১৯৭১ সালের পর কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তুলকালাম হয়েছিল বিশ্বে। তেলের রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। অর্থনীতিতে সংকট দেখা গিয়েছিলো। এখন আসল যুদ্ধ চলছে মধ্য প্রাচ্যে এবং রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে। ভারত পাকিস্তান এক্ষেত্রে হলো সাইড শো। তবে যাতে সাইড শো আবার এই যুদ্ধঙ দেহি চিৎকারের ফলে মূল শো না হয়ে যায় তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , চীন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর আগ্রহ রয়েছে।

ভারতের অভ্যন্তরে দুটি রাজনৈতিক পক্রিয়া চলছে। এক ভারতের বিরাট বাজার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মানে অম্বানী আদানি প্রভৃতিদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখা , আবার আরএসএস কে তুষ্ট করতে ভারতের বিশাল মুসলমান জনসমাজকে আইনি পক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিক অধিকারহীন জন গোষ্ঠীতে পরিণত করা। কিন্তু তার ক্ষেত্রে দুটি বাঁধা। এক ভারতের বৈচিত্রের ফলে গণতান্ত্রিক শক্তি এতে খুব একটা উৎসাহী নয়। দলিত মুসলমান পিছড়েবর্গ সবাই এক হলে মুশকিল। তার উপরে ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে জামাত, তাবলীগ প্রভৃতি সংগঠনগুলি সন্ত্রাসবাদী পথে যেতে পারে। তাদের আর্থিক উৎস বাইরের বহু দেশে রয়েছে।

আর দুই হলো ভারতের প্রায় সাত থেকে আট মিলিয়ন লোক মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত সংযুক্ত আরবশাহীতে চাকরি করেন। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে ভারত প্রায় ১২৫ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে এদের রেম্মিটান্স থেকে। তার উপরে ভারতের তেলের একটি বিরাট অংশ আসে মধ্য প্রাচ্য থেকে। ফলে ভারতে গোরক্ষকদের উস্কে দিয়ে এবং অর্ণব ময়ূখ প্রভৃতি ঘ্যাঁঘাসুরদের আস্কারা দিয়ে নরেন্দ্র মোদীজি প্রায়ই তেল মারতে মধ্যপ্রাচ্য যান। তেল মারা এবং তেল আনা দুইই গুরুত্বপূর্ণ মোদীজির জন্যে নইলে, আমদানি মানে আম্বানি আর আদানি সরকার উল্টে দেবেন।

তার উপরে মাথার উপরে রয়েছে চীন। মোদীজির গুরু মানে ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা বলে শেষ মেশ চীনের সঙ্গে বসে আলোচনা করছেন। সব মিলিয়ে বাগাড়ম্বরের ভিতরে কিন্তু পাকা মাথার সঙ্গে কাজ করতে হয়। ভারতের জনগণ কিন্তু বোকা

নয়। গত নির্বাচনে মোদী সাম্রাজ্য প্রায় উল্টে যাচ্ছিলো। গদি মিডিয়া বলছিলো চারশো পার , কিন্তু ২৫০ পার করতে কাল ঘাম ছুটে গিয়েছিলো । অতএব ভবিষ্যতে বাগাড়ম্বর যদি জনগণ বুঝে ফেলে তখন ? ভাবুন মোদীজি ভাবুন, ভাবা প্রাকটিস করুন।

সেক্যুলার সংবিধান ও সাম্প্রদায়িক সংলাপ

মজিবুর রহমান

রাষ্ট্র ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা বিশেষ ধারণার সমর্থকদের সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়। যারা ধর্মনিরপেক্ষ নয় তারা কমিউন্যাল বা সাম্প্রদায়িক। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভাবধারার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট। ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সংঘাতের সূচনা ব্রিটিশ আমলে। স্বাধীনতা লাভের সাত দশক পরেও তা সমানে চলেছে। সংবিধান সেক্যুলার হয়েছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ শৌর্য হারায়নি। বহুসংখ্যক হিন্দুত্ববাদী ও মুসলমানপন্থী সংগঠনের বিভেদকামী কর্মকাণ্ডের কারণে দেশে শান্তি ও সুস্থিতি স্থায়ী হতে পারেনি। হিন্দু-মুসলমানের বন্ধন বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়েছে। একতার অবসানে অনৈক্য এসেছে। অশান্ত ও অস্থির পরিস্থিতির কারণে ব্যাহত হয়েছে দেশের সার্বিক ও সুসংহত উন্নয়ন।

হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং কংগ্রেস-লীগের প্রচণ্ড তিক্ততার মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয়। বাংলার পূর্বাংশ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে ৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম ছিল যথাক্রমে ৮৫ ও ১৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ভারতের ৩৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও অহিন্দু ছিল যথাক্রমে ৮০ ও ২০ শতাংশ। পাকিস্তান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে এবং ইসলামিক দেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ভারত বৈদিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেনি অথবা হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। ভারতের সংবিধান রচয়িতারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। সংবিধান রচনার সময় কোনো ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়নি। কোনো আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়নি। সকল পার্থিব বিষয়কে বাস্তব বোধবুদ্ধি ও যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করা হয়েছে। একটি ধর্মশাস্ত্র একটি সম্প্রদায়ের কিন্তু সংবিধান সকলের। সুতরাং, সংবিধানে ধার্মিক-অধার্মিক, আস্তিক-নাস্তিক সবার সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য বা বাছবিচার করা হবে না। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের ওপর আলোকপাত করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন কয়েকটি ধারা হল (১) ১৪- রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের চোখে সমান অধিকার এবং আইনের সমান সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে না। (২) ১৫- রাষ্ট্র কাউকে ধর্ম, জাতপাত, লিঙ্গ, জন্মস্থান প্রভৃতির কারণে আলাদা করে দেখবে না; দোকান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, প্রমোদগৃহ প্রভৃতি স্থানে প্রবেশে এবং পুকুর, স্নানের ঘাট, রাস্তা, সরকারি স্থান ব্যবহারে বাধা দেবে না। (৩) ১৬- সরকারি চাকরিতে কোনোরকম বৈষম্য করা যাবে না। (৪) ১৭- অস্পৃশ্যতা বাতিল ও নিষিদ্ধ। (৫) ২৫- সকল মানুষ বিবেক অনুসারে স্বাধীনভাবে ধর্মগ্রহণ, ধর্মাচরণ এবং ধর্ম প্রচার করার অধিকার ভোগ করবে। (৬) ২৬- সব ধর্মই (ক) ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনা করতে পারবে; (খ) ধর্ম সম্পর্কিত কাজকর্ম করতে পারবে; (গ) স্বাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিনতে ও রাখতে এবং (ঘ) আইন অনুসারে সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে। (৭) ২৭- কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ধর্মীয় কাজের জন্য কর আদায় করা যাবে না। (৮) ২৮- পুরোপুরি সরকারি কোষাগার থেকে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও উপাসনা করা যাবে না। (৯) ২৯- সরকারি অর্থে পরিচালিত অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, জাতপাত, ভাষা প্রভৃতির কারণে কোনো নাগরিকের প্রবেশাধিকারে বাধা দেওয়া যাবে না। (১০) ৩০- ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকার কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করবে না।

গণপরিষদ সংবিধানে এই সমস্ত ধারা সন্নিবিষ্ট করে সংখ্যালঘু কিন্তু দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের মধ্যে একটা আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকলেও সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে 'সেক্যুলার' শধটি উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। জরুরি অবস্থা চলাকালে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধির উদ্যোগে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ওই 'সেক্যুলার ' ও ' সমাজতান্ত্রিক ' শধ দুটি সংযোজন করা হয়।

ভারত একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র কিন্তু ভারতের রাজনীতি ও সমাজ সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে কখনও মুক্ত হতে পারেনি। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে একটার পর একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনগুলো স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নয়নের চেষ্টার পাশাপাশি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে। তারা ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং বিদ্বেষ ছড়ায়। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর সমষ্টি সঙ্ঘ পরিবার নামে পরিচিত। সঙ্ঘ পরিবারের প্রথম সন্তান অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা জন্মলাভ করে ১৯১৫ সালে। হিন্দুত্ববাদকে তীব্রতর করার লক্ষ্যে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ১৯৪৮ সালে গান্ধিজির হত্যাকাণ্ডের পর, ১৯৭৫-'৭৭ সালে জরুরি অবস্থার সময় এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আর এস এস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫১ সালে গঠিত হয় হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনসঙ্ঘ। ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মহারাষ্ট্রভিত্তিক

হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল শিবসেনার পথ চলা শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নাম ধারণ করে। ১৯৮৪ সালে গঠিত হয় হিন্দুত্ববাদী যুব সংগঠন বজরং দল। মহিলা সংগঠন দুর্গা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, পেশাগত, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে সঙ্ঘ পরিবারে আশির বেশি সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনগুলো অহিন্দু বিশেষ করে মুসলমানদের সম্পর্কে অত্যন্ত নিম্ন ও নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। সঙ্ঘ পরিবার ভারত পরিবারে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে!

মুসলমানপন্থী রাজনৈতিক দল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সংহতি স্থাপন করার লক্ষ্যে ১৯২৭ সালে গঠিত হয় মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলেমিন বা মিম। ব্যারিস্টার আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি এখন এই দলের সর্বময় কর্তা। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন জামায়াত-ই-ইসলামী। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে এটি জামায়াত-ই-ইসলামী হিন্দ নামে পুনর্গঠিত হয়। স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া বা সিমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে। ২০০১ সাল থেকে এই সংগঠনটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া। ২০২২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের অধীনে এই সংগঠনটিকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নিবন্ধিত ও অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয় ২০০৯ সালে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে হুগলি ফুরফুরা শরীফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর উদ্যোগে আবির্ভূত হয় ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট। এছাড়া আরও অনেক ইসলামিক সংগঠন রয়েছে যেগুলো সর্বধর্ম সমন্বয় অথবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে।

সাংবিধানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র হওয়ায় ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আয়োজন করার কথা নয়। মুসলমানের রোজাতেও আছি, হিন্দুর পূজাতেও আছি- সরকারের এরূপ মনোভাব হবে না; বরং তার অবস্থান হবে- রোজাতেও নেই, পূজাতেও নেই। নাগরিকরা যাতে ধর্ম পালন করতে পারে, সরকার নিশ্চয়ই তা নিশ্চিত করবে কিন্তু সে নিজে কোনো ধর্ম পালন করবে না। এই ভাবনা থেকেই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫১ সালের মে মাসে সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে উপস্থিত থাকার জন্য আপত্তি করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, গত দেড়-দুই দশকে রাষ্ট্র ও ধর্মকে কার্যত একাকার হতে দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান কর্তাব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। লোকসভার নির্বাচন চলার সময় গুহায় ধ্যানে বসেছেন। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ একজন সন্ন্যাসী। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও সেক্যুলার থাকার চেষ্টা করেন না। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন তখন মাওলানা অথবা মহারাজ সাজেন। রমজান মাসে ইফতার করেন, ঈদের নামাজে 'খুতবা' দেন। ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে ইমাম-মোয়াজ্জীনদের জন্য ভাতা চালু করে ক্রেডিট নেন। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের করের টাকায় পুরোহিত ভাতা প্রদান করেন। বোধনের আগেই দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন। ষষ্ঠীর বদলে দ্বিতীয়া থেকেই প্যান্ডেল পরিক্রমা শুরু হয়ে যায়। সরকারি কোষাগার থেকে হাজার হাজার পুজো কমিটিকে টাকা দেওয়া হয়। প্রতিমা বিসর্জনের প্রাক্কালে কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দীঘায় ২৫০ কোটি ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে জগন্নাথ ধাম। অন্যান্য মন্দিরগুলোর সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সরকার আরও ৭০০ কোটি খরচ করেছে। কিন্তু উপাসনালয় নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা তো সরকারের কাজ নয়।

সাম্প্রদায়িকতা অনেক ক্ষেত্রেই একটি সাংগঠনিক বিষয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থেকেও অনেকেই দলীয় নেতা হিসেবে সাম্প্রদায়িক আচরণ করেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হিন্দুত্ববাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বিনায়ক দামোদর সাভারকর ধর্ম পালনের প্রশ্নে প্রায় নাস্তিক ছিলেন। মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নেতা তথা পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে কখনও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে দেখা যায়নি। আবার, ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক হয়েও রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাসী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এবং প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাজী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন ব্যক্তি যখন যে দলে থাকেন তখন সেই দলের আদর্শ অনুসরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের দলবদলু নেতাদের দেখলেই তা বোঝা যায়। যেমন, একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও মন্ত্রী থাকাকালীন গোমাংস খেতেন, ইফতারে মোনাজাত করতেন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সমর্থনে ভাষণ দিতেন। এখন বিজেপির বিধায়ক ও বিরোধী দলনেতা হয়ে প্রত্যহ পাগলের প্রলাপ বকছেন। সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। প্রকাশ্যে বলছেন, মুসলমানদের ভোট চাই না। একজন আইনজীবী ও রাজনৈতিক কর্মী মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পণ নিয়ে মাথা ন্যাড়া করে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে গেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ছেড়ে হিন্দুত্ববাদকে আলিঙ্গন করেছেন। একজন গায়ক-কাম-রাজনীতিক বিজেপির মন্ত্রী থাকাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে গান বাঁধতেন। এখন মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভার সদস্য হয়ে মুসলমানদের সমাবেশে বক্তৃতা আর তৃণমূলের গুণগান করছেন।

কোনও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে আধুনিক বিশ্বের একটি দেশের বহুমাত্রিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার বিশেষ পরিবর্তন না ঘটলেও বস্তু জগত প্রতিনিয়ত

পাল্টাচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন কানুন বদলাতে হয়। ধর্মশাস্ত্র অপরিবর্তনীয়, তার সংস্কার সম্ভব নয়। কিন্তু প্রয়োজনমতো দেশের সংবিধান সংশোধন করা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সংবিধানের স্থান সর্বোচ্চে। সেক্যুলার সংবিধানের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে সব পরিস্থিতিতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় থাকা জরুরি। সাধারণ মানুষকেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং যেকোনো রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় সংগঠনের নেতাকর্মীদের সৃষ্ট প্ররোচনা থেকে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে। সাম্প্রদায়িক হওয়া সহজ কিন্তু সেক্যুলার থাকা কঠিন। সমাজ সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এই কঠিন কাজটাই করে যেতে হবে।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুল - এর প্রধান শিক্ষক)

জাতি গণনার নীতি ও রাজনীতি

অশোক সরকার

কেন্দ্রীয় সরকার জাতি গণনা হবে ঘোষণা করায় বিতর্ক এখন তুঙ্গে। এই সুযোগে আমরাও বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারি। নীতি রাজনীতি-তে ঢোকার আগে সেন্সাসে কি করা হয় আর কি হয় না, আসুন সেটি একবার দেখে নি।

আমরা সবাই জানি সেন্সাসের একটি অঙ্গ হল সেন্সাস কর্মীরা বাড়ি বাড়ি এসে জেনে নেন বাড়িতে কত মানুষ, কতজন মহিলা পুরুষ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে জিগ্যেস করেন আপানার মাতৃভাষা, ধর্ম কি, জাতি কি। ধর্মের বেলায় আমরা যদি বলি আমরা নাস্তিক, আমরা অজ্ঞেয়বাদী, আমাদের ধর্ম জানি না, সেটাই রেকর্ড করা হয়। ভাষার বেলাতেও আমরা যা বলি তাই রেকর্ড করা হয়। জাতি-র বেলায় বিষয়টা একটু জটিল। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তপশিলী জাতি, জনজাতি-র মানুষদের রেকর্ড করার কথা। এই দুই জাতি-বর্গের মধ্যে কারা পড়েন, তার রাজ্য অনুযায়ী তালিকা আছে। তাই যদি বলি, আমি তপশিলী জাতি তাহলে সেন্সাস কর্মীরা জিগ্যেস করবেন কি জাতি? আমার উত্তর তাঁরা তালিকা অনুযায়ী মিলিয়ে লিখে নেন। যদি বলি আমি ওবিসি তাহলে সেন্সাস কর্মীরা লিখবেন 'সাধারণ' বা general। যদি বলি ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি, সেন্সাস কর্মীরা 'সাধারণ' ই লিখবেন। কিন্তু যদি বলি আমি তপশিলী জনজাতি তাহলে আমায় জিগ্যেস করা হবে কোন জনজাতি। সাঁওতাল, ওঁরাও মুন্ডা বা আমি যা বলব, সেন্সাস কর্মীরা তাঁদের কাছে থাকা তালিকা অনুসারে সেই জনজাতি লিখে নেবেন।

এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরে সব সেন্সাসেই চলে আসছে। জাতি গণনা মানে সব জাতি-র জন্যই ওই গণনা করা। তাহলে সেন্সাসে কি পালটাবে? পালটাবে সামান্যই। এখন যেমন ওবিসি ও সাধারণ জাতির জন্য শুধুই 'সাধারণ' বা general লিখে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন তার বদলে সবাইকেই তার জাতি জিগ্যেস করতে হবে। তবে তপশিলী জাতি জনজাতির যেমন তৈরি তালিকা আছে, অন্যান্য জাতিগুলির তা নেই। কাজেই মানুষ যে জাতি বলবে তাই লিখতে হবে, এবং পরে সেই জাতি-নামগুলিকে যাচাই করে মিলিয়ে একটা তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তাতে তিন চার বছর সময় লাগবে। এতে চিন্তার কিছু নেই, এমনিতেই সেন্সাসের সব তথ্য প্রকাশ হতে চার পাঁচ বছর লেগেই যায়।

তাহলে এই নিয়ে এত হট্টগোল কেন? সে কথায় আসব তার আগে জাতি গণনার কথা নীতির দিক থেকে কেন উঠছে, তাই নিয়ে কিছু স্পষ্টীকরণ দরকার। ওবিসি সংরক্ষণ কথাটার সঙ্গে আমরা সবাই এখন কমবেশি পরিচিত। এই কথাটি ভারতের সংরক্ষণ নীতির আঙিনায় হাজির হয়েছিল মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের ফলে। মণ্ডল কমিশন ৫০ লক্ষের কাছাকাছি মানুষকে সার্ভে করে বলেছিল ওবিসি জাতি বর্গটি জনসংখ্যার প্রায় ৫২ ভাগ, এবং তার মধ্যে ৩৭৪৩টি জাতির খোঁজ তারা পেয়েছিল।

তার ভিত্তিতে সরকারি শিক্ষা ও চাকরি জগতে ওবিসি সংরক্ষণ চালু হয়। রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারকেই সংরক্ষণ করতে হয়। তাই দাবি ওঠে কোন রাজ্যে কত ওবিসি ও তাদের কি জাতি তা সেন্সাসে আনতে হবে। ১৯৯২ সালে ইন্দ্র সাহানি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যখন বলে দিল যে ওবিসি সংরক্ষণ সংবিধান সম্মত, তখন থেকে এই দাবি আরও জোরদার হল। সেটা অবশ্য শুধুই ওবিসি সেন্সাস, পূর্ণ জাতি গণনা নয়। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক জাতি গণনা চেয়ে ক্যাবিনেট নোট পাঠিয়েছিল ছিল, তখনকার সেন্সাস অধিকর্তাও জাতি গণনা চেয়ে সরকারের কাছে সওয়াল করেন, গৃহীত হয়নি। ২০১০ সালে লোকসভা এই বিষয়ে দুদিন টানা আলোচনা করে ও বিজেপি সহ প্রায় সব দলই জাতি গণনায় সহমত হয়। তাও হয় নি। ২০১১-এর যে জাতি গণনা করা করা হয়েছিল যার পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন ছিল, সেই তথ্যও সরকার জনসমক্ষে প্রকাশ করে নি। এই বিষয়ে backward classes কমিশনও একাধিকবার জাতি গণনার সুপারিশ করেছে, তাও হয় নি। অর্থাৎ দল নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় সরকার জাতি গণনা এড়াতে চেয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে ২০২২ সালে বিহার সরকার জাতি গণনা করে দেখায়, তাকে সেন্সাস বলা যায় না, কিন্তু জাতি সার্ভে বলা যায়। সেই রিপোর্ট ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তারপর একে একে কর্ণাটক তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানা এই জাতি সার্ভে করে ফেলেছে। আর রাহুল গান্ধী এটাকে তার রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে জাতিগণনার দাবিকে সর্বজনীন করার চেষ্টা করেছেন। মণ্ডল কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলির সবাই জাতি গণনার পক্ষে নানা ভাবে সোচ্চার হয়েছে।

তপশিলী জাতি জনজাতি বা ওবিসি সেন্সাস-এর কথা কেন ওঠে? এর উৎস আছে, সংবিধানে। তপশিলী জাতি জনজাতি সমুদায় দেশে

বহুবিধ বঞ্চনার শিকার এবং তার বীজ সমাজের অনেক গভীরে। সংবিধান এই বাস্তবতা স্বীকার করেছিল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জাতি বঞ্চনা কমাতে গেলে, নির্মূল করতে হলে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। তার একটি হল সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ। ওবিসি সংরক্ষণ ঐ একই পংতিতেই পড়ে। সংরক্ষণ করতে গেলে জানতে হয় ঐ বর্গগুলির মধ্যে সত্যিই কারা আছেন, তাঁদের সংখ্যা কত, জাতি-বর্গ (ঞ্ঝখন্ঠ্র ঋদ্রন্ড্ম)গুলি মোট জনসংখ্যার কত অংশ, তাঁদের বর্তমান শিক্ষা কতদূর, কি ধরণের পেশায় তাঁরা যুক্ত, তাঁরা সমাজে কোন স্তরে অবস্থিত ইত্যাদি।

পূর্ণ জাতি গণনার অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। পূর্ণ জাতি গণনা মানে শুধু ওবিসি নয়, উচ্চ জাতিগুলিরও জাতি ভিত্তিক গণনা। তার দরকার কি? যদি তপশিলী জাতি জনজাতি ওবিসিদের সংরক্ষণ দিতে হয়, তাদের গণনা করলেই তো হয়? পূর্ণ জাতি গণনা করলে দুটি চিত্র পরিষ্কার হবে। এক উচ্চ জাতিগুলি জনসংখ্যার কত অংশ, উচ্চ জাতি বর্গটি জনসংখ্যার কত অংশ, আর জানা যাবে শিক্ষায়, চাকরিতে, ব্যবসায়, এলিট পেশাগুলিতে (ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ম্যানেজমেন্ট পেশায় নিযুক্ত কর্মী) এঁদের কতটা ভাগ আছে, তখন জনজাতি তপশিলী জাতি আর ওবিসিদের সঙ্গে এই উচ্চ বর্গের সঠিক তুলনা করা যাবে।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে তপশিলী জাতি জনজাতি সংরক্ষণ সেন্সাসের তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওবিসি সংরক্ষণ যা হয়েছে, তার কোন আধার বা ভিত্তি নেই, কারণ তারা জনসংখ্যার কত অংশ তা জানা নেই। কাজেই নীতিগত ভাবে জাতি গণনার প্রস্তাবের কোন বিরোধ হতে পারে না।

কিন্তু রাজনীতিতে? ১৯৯০-এর পরে ভারতীয় রাজনীতিতে যে সব পরিবর্তন হয়েছে তার অন্যতম হল যাকে হিন্দিতে মণ্ডল বনাম কমন্ডলের রাজনীতি বলা হয়। মণ্ডলের রাজনীতির উৎপত্তি অবশ্য অনেক আগেই হয়েছে, কর্পূরী ঠাকুর রাম মনোহর লোহিয়া প্রমুখের হাতে, তবে ১৯৯০এর পরে তা একেবারেই রাজনীতির মূল স্রোতে জায়গা নিয়েছে। কমন্ডলের রাজনীতিও তাই। উৎপত্তি অনেক আগে হিন্দু মহাসভা জনসঙ্ঘের হাতে, কিন্তু মূল স্রোতে জায়গা নিয়েছে লালকৃষ্ণ আডভানী ও অন্যান্যদের হাতে। মণ্ডল রাজনীতির মধ্যে কয়েকটি শাখাস্রোত বর্তমান , এক, সংরক্ষণ, দুই, ধর্মনিরপেক্ষতা, তিন, কমন্ডল বিরোধিতা আর চার, রাষ্ট্র ক্ষমতা। কিন্তু মণ্ডল রাজনীতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হল, তা ওবিসি তপশিলী জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে কোন সামাজিক ঐক্য তৈরি করতে পারেনি। মাঝে মাঝে নির্বাচনী ঐক্য হয়েছে, ভেঙ্গেও গেছে। এর কারণ সামাজিক ও দৈনন্দিন স্তরে এই জাতিগুলির মধ্যে অনৈক্য, বৈরিতা, অবিশ্বাস, ও সন্দেহের বাতাবরণ। তাই যাদবরা ক্ষমতায় এলে জাতভদের কোন সুবিধা হয় না, জাতভ-রা ক্ষমতায় এলে বাল্মীকিদের কোন সুবিধা হয় না। মণ্ডলের সামাজিক উত্থান উচ্চ জাতি বর্ণের সামাজিক ক্ষমতা ও প্রাধান্য-য় আঘাত করতে পেরেছে ঠিকই, সমাজে তাতে এক বিশাল মন্থন শুরু হয়েছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বৃহত্তর জাতি ঐক্যের অভাবে তা সামাজিক সাম্যের দিকে খুব বেশি দূর এগোয়নি। আদিবাসীদের সঙ্গে তো দলিত ওবিসিদের সামান্যতম ঐক্যই তৈরি হয় নি। সেই কারণে বিশেষত উত্তর ভারতে মণ্ডলের রাজনীতি উন্নয়নের প্রশ্নে কোন সুনির্দিষ্ট পথ দেখাতে পারে নি। একাধিক জাতির নিজস্ব দল তৈরি হয়েছে -- যাদব, জাঠ, কুশওয়া, নিষাদ, পাশয়ান, মালা মাদিগা, কামা, কুরমি ইত্যাদি, যার ফলে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে ঠিকই কিন্তু গণতন্ত্র নির্বাচনী রাজনীতির পাটিগণিতে আটকে গেছে। সমাজের গভীরে ঢোকেনি।

কেন এমন হল? কেন জাতি রাজনীতি দলিত আদিবাসী ওবিসিদের বৃহত্তর জাতি ঐক্য তৈরি করতে পারল না? আমার মনে হয় তার কারণ রাজনীতির চরিত্রে। রাজনীতি যদি শুধুই সংরক্ষণ আর নির্বাচনী ক্ষমতা নিয়ে কথা বলে তাহলে বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ভাবনাটি হারিয়ে যায়। সেই ভাবনার সহজ মূল কথাটি হল ওবিসি দলিত আদিবাসী মুসলমান - এরা সামাজিকভাবে আলাদা হলেও অর্থনীতিতে এরা প্রায় একই জায়গায় , কৃষি অথবা অসংগঠিত ক্ষেত্রের অদক্ষ বা অর্ধ দক্ষ শ্রমিক বা উৎপাদক। Creamy Layer অংশটি বাদ দিলে বাকিরা রোজগার ও সম্পদের সারণীতে নিচের ২০-৩০ ভাগের মধ্যেই পড়ে। তাই বৃহত্তর ঐক্য তৈরি করতে গেলে শুধু সংরক্ষণ বা নির্বাচনী আসনের পাটিগণিত নিয়ে ভাবলে চলে না, জাতি-র অনৈক্যের মধ্যে শ্রমিক-উৎপাদকের ঐক্য খুঁজতে হয়, তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্য তৈরি করতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে সাংবিধানিক মূল্যবোধেরও সেচনের দরকার হয়, যা জাতি পরিচয়কে অতিক্রম করে মানবিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সামাজিক একতার কথা বলে।

এই প্রসঙ্গে সেবা নামক দুনিয়ার সর্ব বৃহৎ মহিলা ট্রেড ইউনিয়নের পথিকৃৎ ইলা ভাটের লেখা এক কাহিনী মনে পড়ছে। তাঁরা আমেদাবাদে মেয়েদের শ্রমিক সমবায় তৈরি করেছিলেন সেই সমবায় বিভিন্ন সরকারি অফিসের ঘরদোর-টয়লেট সাফ করার কাজ নিত। মহিলা শ্রমিক সমবায়ের সদস্যরা সেই কাজ করতেন। সমবায়ের মধ্যে নানা জাতির মহিলা আছেন। সরকারি অফিসের বাথরুম সাফ করার কাজ সমবায়ের সদস্য ভাঙ্গি জাতি-র মহিলারাই করতেন। কারণ সামাজিকভাবে ময়লা সাফ করাটাই তাঁদের পরিচিতি। অন্য জাতির মহিলারা করতে চাইতেন না। এই নিয়ে শ্রমিক সমবায়টি ভেঙ্গে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সেবার নেত্রীরা কয়েক মাসের চেষ্টায় শ্রমিক সমবায়ে এক নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন , কাজের ছোট বড় নেই, সব কাজই সবার।

মুল কথাটি সরল। জাতি ঐক্য তৈরি হওয়া দরকার তার জন্য শ্রমের ঐক্যের কথা রাজনীতিতে আনতেই হবে। আজকের জাতি রাজনীতি তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তার ফলে নীতিগতভাবে জাতি গণনার প্রয়োজনকে অস্বীকার না করলেও তার রাজনীতি কোন দিকে গড়াবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

জাতি গণনার বিরোধিতায় মূলত দুই রকমের যুক্তি শুনতে পাচ্ছি। প্রথম যুক্তিটা হচ্ছে জাতি ব্যবস্থা এমনিতেই পিছু হটছে। শহুরে আধুনিক মানুষ জাতি-তে আগ্রহী নয়, কাজেই যেটা ইতিমধ্যেই পিছু হটছে তাকে নিয়ে এত মাথাব্যাথা কেন? এই যুক্তির সারবত্তা বিশেষ নেই। জাতি ব্যবস্থার তিনটি অঙ্গের মধ্যে দুটি অঙ্গ কিছুটা পিছু হটেছে ঠিকই এবং তার জন্য সংরক্ষণ নীতিই অনেকটা দায়ী, আর বাকিটা সমাজের মধ্যে বাজার ব্যবস্থার নিবিড় অনুপ্রবেশের জন্য। এই দুটি অঙ্গ হল ছোঁয়াছুৎ আর জাতি-শ্রমের অবশ্যম্ভাবী সমন্বয়। সংরক্ষণের ফলে আজ অফিসে, বাসে, থানায়, ট্রেনে সব জাতির মানুষের পাশেই আপনাকে বসতে হচ্ছে, হাত মেলাতে হচ্ছে, দেয়া নেয়া করতে হচ্ছে, পাশয়ানের ছেলে ব্রাহ্মণকে এয়ারপোর্টে দেহ তল্লাশি করছে করছে, পাশাপাশি কুরমির ছেলে সুইগির ডেলিভারি বয় হয়ে আপনাকে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে অস্পৃশ্যতা কমেছে কোন সন্দেহ নেই। আর সংরক্ষণের ফলেই চামারের মেয়ে স্কুল টিচার হয়েছে, কুরমির ছেলে থানার ইন্সপেক্টর হচ্ছে, সাঁওতাল মেয়েও সরকারি দপ্তরে কলম চালাচ্ছে। ফলে জাতির যে সাবেকি পেশা ছিল সেই পেশাতেই সে আর আবদ্ধ থাকছেনা। সংরক্ষণের বলয় বাড়লে তবেই জাতি ব্যবস্থার এই দুটি অঙ্গ আরও পিছু হটবে। আর তাছাড়া শহরের মানুষ যদি জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়েই থাকে তাহলে সেটা তো জাতি গণনাতেই বেরিয়ে আসবে। শহরের লোকেরা বলেই দেবে তআমাদের জাত নেইদ বা তআমি আমার জাত জানি নাদ বা তআমার জাত কি বলব নাদ, সেটাই রেকর্ড হবে। প্রসঙ্গত বলা কর্ণাটকে সে জাতি সার্ভে হয়েছে তাতে ২.৫ লাখ মানুষ তাদের জাতি বলতে চান নি, সেটাই রেকর্ড হয়েছে।

জাতি গণনার বিরোধিতায় দ্বিতীয় যুক্তিটি হল জাতি গণনা সমাজে ও রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব কমার বদলে আসলে জাতিকেই রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসবে, আরও বেশি করে পোক্ত করবে। সমাজকে তা আরও বেশি টুকরো করবে। এর বিপরীতে এক ধরণের জাতি ঐক্যের সম্ভাবনা দেশ ইতিমধ্যেই দেখেছে, হিন্দু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ে, পাশাপাশি মুসলমান বিরোধিতাতেও এক হতে দেখেছে। এই যুক্তির একেবারে কোন সারবত্তা নেই তা নয়। একাধিক রাজ্যে এই ধরণের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য যে ব্যাপক ও গভীর হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐক্যের পিছনে যেটা লুকিয়ে থাকে তা হল এক সামাজিক অনুক্রমের (Hierarchy) ধারণা। এই অনুক্রম জাতিব্যবস্থাকেই ঐতিহাসিকভাবে পোক্ত করেছে, সমাজে এই ধারণা পোক্ত করেছে জাতি ব্যবস্থা ঈশ্বর প্রদত্ত তাই স্বাভাবিক। যে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, তা সামাজিক ন্যায়ের লক্ষে ঐক্য নয়, বরং জাতি ব্যবস্থার Hegemony টা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। আর অবশ্যই নির্বাচনী পাটিগণিতের উদ্দেশ্যে।

জাতি গণনাকে সামাজিক ন্যায়ের লক্ষে ফলপ্রসূ করতে হলে, একদিকে যেমন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক hegemony কে আঘাত করতে হবে, অন্যদিকে দলিত আদিবাসী ওবিসিদের মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, এবং তার জন্য হাতে একটিই পাথেয় আছে, জাতি রাজনীতির মধ্যে শ্রমিক উৎপাদকের রাজনীতিকে জায়গা দেওয়া। সেটা করতে গেলে শুধু সরকারি ক্ষেত্রে নয় সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পদক্ষেপ বা affirmative action নীতিকে লাগু করতে হবে।

(লেখক আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

‘‘আদিবাসীদের হত্যা করার পর আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা নাচে’’— সোনি সোরি

মীনা কান্ডাসামি একজন নারীবাদী কবি ও লেখক। গত এক দশক ধরে লিখিত তাঁর রাজনৈতিক কবিতার সংকলন Tomorrow Someone Will Arrest You সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সোনি সোরির এই সাক্ষাৎকারটি মীনা নিয়েছিলেন হিন্দিতে, যেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন দিব্যা কে, এবং সেটি ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় গত ১৫ মার্চ।
বাংলা অনুবাদ ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ।

সোনি সোরি ভারতের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের রক্তাক্ত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জীবনগাথা ছত্তিশগড়ের খনিজ-সমৃদ্ধ অরণ্যের মালিকানা নিয়ে আদিবাসীদের ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘকালীন সংঘাতকেই প্রতিফলিত করে। ২০১১ সালে, যখন রাষ্ট্র তাঁকে মাওবাদী আখ্যা দেয়, তখন এটি শুধু একটি মতাদর্শকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার পুরনো খেলাটাই খেলেনি, বরং প্রতিরোধের প্রতিটি রূপকেও দমন করার চেষ্টা করেছে। তাঁর দুই বছরের কারাবাস হয়ে ওঠে এক জীবন্ত প্রমাণ; কীভাবে ভারত তার সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারাগারের অভ্যন্তরে, সেই সময়ের জেলা পুলিশ সুপার অঙ্কিত গর্গ তাঁর উপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ আছে; পরবর্তীতে এই গর্গ ‘প্রেসিডেন্ট’স পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি’ পুরস্কার লাভ করেন।

কিন্তু সোরি নিজেকে একজন শিকার বা নিপীড়িত হিসেবে তুলে ধরতে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি নিজেকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করেছেন যা রাষ্ট্র সবচেয়ে ভয় পায়; একজন ক্রনিকলার, একজন সাক্ষী; যিনি কথা বলেন। ২০১৬ সালে তাঁর ওপর অ্যাসিড হামলা হয়েছিল, কিন্তু সেটাও তাঁকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের এই রাষ্ট্রীয় মেশিনারির নথিবদ্ধকরণ থেকে বিরত করতে পারেনি। সাম্প্রতিক সাক্ষ্যপ্রমাণে তিনি ‘অপারেশন কাগার’-কে আদিবাসীদের জমি ও মর্যাদাহানির লক্ষ্যে চালিত একটি প্রতারণামূলক অপারেশন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সোনি তীব্রভাবে কথা বলেন, আকুতি নিয়ে কথা বলেন; উন্নয়নের কুৎসিত ঢক্কানিনাদ আর ধ্বংসযজ্ঞের অশুভ আঁতাতের মুখোশ খুলে দেন। রাষ্ট্র যেখানে রাস্তা দেখতে পায়, তিনি সেখানে দেখেন শোষণের শিরা-উপশিরা, যা জীবিকা, খনিজ, সম্পদ ও আদিবাসী রক্ত শুষে নিচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তারা যখন নিরাপত্তা শিবির ও বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লাস করেন, তিনি তখন অত্যাচার, উচ্ছেদ ও ধর্ষণের ভয়াবহতা চিত্রিত করেন। যখন কর্পোরেট মিডিয়া মিথ্যা উন্নয়নের গল্প প্রচার করে, তখন তিনি দেশের মূলবাসী জনগণকে প্রদত্ত সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতিগুলির পরিকল্পিত ধ্বংসের নথি তৈরি করেন। এই সাক্ষাৎকারে সোরি বলেন, যখন কোনও ভূমি সম্পদে সমৃদ্ধ হয় এবং জনগণ নিজেদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে অস্বীকার করে, তখন গণতন্ত্র সামরিক দখলদারিত্বে রূপ নেয়। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সারাংশ নিচে দেওয়া হল।

মীনা কান্ডাসামি : আমার প্রথম প্রশ্ন হল ক্রমবর্ধমান কর্মী-গ্রেপ্তার সম্পর্কেখ মূলবাসী বাঁচাও মঞ্চ (MBM)-এর সাবেক প্রধান রঘু মিডিয়ামি গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত বছর, কর্মী নেত্রী সুনীতা পোট্টাম গ্রেপ্তার হন। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে ছত্তিশগড় সরকার MBM নিষিদ্ধ করে। আপনি এই দমন-পীড়ন সম্পর্কে কী ভাবছেন?

সোনি সোরি : প্রতিদিন পাঁচ থেকে দশজন আদিবাসী গ্রেপ্তার হয়; ভুয়ো এনকাউন্টার সংঘটিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হল আদিবাসীদের জীবন শেষ করে দেওয়া। যে-ই বস্তার অঞ্চলে প্রতিরোধ করে, সে MBMই হোক, সোনি সোরিই হোক বা হিদমে মারকম; তাকে নকশাল আখ্যা দিয়ে নির্মূল করা হয়। একই ঘটনা সুনীতার ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

সুনীতার জন্মস্থান বিজাপুর জেলার গঙ্গালুর (তাঁর বাড়ি পোসনার-এ), যেখানকার ভর্তি পাহাড়গুলো সব খনি প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি খনন কার্যক্রম চালাতে চায়, তারা কাকে নিশানা করবে? অবশ্যই সেখানে বসবাসরত আদিবাসীদের। জমি দখল করতে হলে, প্রথমে আদিবাসীদের নির্মূল করতে হবে। আর আদিবাসীদের নির্মূল করতে হলে, তাদের নেতাদের নিষিদ্ধ করতে হবে, গ্রেপ্তার করতে হবে। এটি একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় কৌশল; আদিবাসীদের বনাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা এবং খনিজ-সমৃদ্ধ পাহাড়গুলোকে বড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া। 'নকশাল' একটি তকমা মাত্র। প্রকৃত লড়াইটা বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।

অমিত শাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে অপারেশন কাগার মাওবাদী/নকশালবাদ নির্মূল করবে। এর আগের অভিযানটার নাম ছিল সমাধান-প্রহার; তার আগেও আরও নানা নাম এসেছে। জনসমক্ষে এই ধরনের সময়সীমা নির্ধারণের কারণ কী? যা এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, তা নতুন কিছু নয়। এই কথাগুলো আগেও বলা হয়েছে। শুধু এবার তিনি এটি আরও সক্রিয়ভাবে প্রচার করছেন; এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে, সর্বত্র।

এর আগে সালওয়া জুদুম ছিল। তারা সবচেয়ে বেশি নৃশংসতা কাদের ওপর দেখিয়েছিল? আদিবাসীদের ওপর। এরপর ছিল বাস্তার ব্যাটালিয়ন, দান্তেশ্বরী ফাইটার্স, কোবরা ব্যাটালিয়ন এবং অন্যান্য বিশেষ বাহিনী। পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হল, নানারকমের সেনাবাহিনী আনা হল; সবই আদিবাসীদের নির্মূল করার জন্য। ভুয়ো এনকাউন্টারগুলো যেখানে হয়, আমাদের সেখানে যেতেও দেওয়া হয় না, প্রশ্ন করতেও দেওয়া হয় না। যখন আমরা গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে আমাদের কথা শোনাতে চাই, আমাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। রাষ্ট্র পুরো বিশ্বের কাছে নিজের বক্তব্য রাখে, কিন্তু বস্তার অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং সমাজকর্মীদের কণ্ঠস্বর চেপে রাখা হয়।

অমিত শাহ বলছেন, ২০২৬ সালের মধ্যে মাওবাদীদের নির্মূল করা হবে। এর পেছনের প্রকৃত কৌশলটা কী? যদি কাউকে মাওবাদী হিসেবে হত্যা হয়, তবে দাবি করা হয় যে তার মাথার দাম দুই লাখ, তিন লাখ, চার লাখ টাকা ছিল। আসলে, আদিবাসী কৃষকদেরই এইভাবে হত্যা করা হচ্ছে, কিন্তু তাদের মাওবাদী বলে তকমা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি ৬০ লাখ বা ১.৫ কোটি টাকা মাথার দাম থাকার গল্পও শোনা গেছে। হত্যা করো, পুরস্কার নাও। কিন্তু আইন অনুযায়ী কী হওয়া উচিত? প্রথমত, একজন নিহত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত করা উচিত। নিহত ব্যক্তি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জানানো উচিত। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া উচিত। গ্রামবাসীদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা লেখাপড়া জানে, তাদের জানানো উচিত। কিন্তু সরকার এসব কিছুই করে না। কোনও ময়নাতদন্ত করে না। খবরের কাগজে কোনও তথ্য প্রকাশ করে না। একজন মানুষকে মারার পর তার নামে পুরস্কারের অর্থ ঘোষণা করা হয়। এ কারণেই প্রতিদিন এত রক্তপাত ঘটে। একজনকে হত্যা করো এবং অর্থ নাও। আত্মসমর্পণ করো এবং অর্থ নাও। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন হল; এই অর্থ কোথা থেকে আসে? এই টাকার কি কোনও হিসাব আছে?

এত সামরিকীকরণের মধ্যেও গুলিবর্ষণ কিন্তু বন্ধ হয়নি। যদি সত্যিই অমিত শাহ এবং কেন্দ্র সরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তাহলে নিরীহ আদিবাসীদের হত্যা না করে, জঙ্গল পাহাড় ধ্বংস না করে, পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করে তারা তা করুক। এখন পাহাড় জ্বলছে, নদীগুলো ধ্বংস হচ্ছে, আদিবাসী শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। তারা বলছে, মাওবাদীদের নির্মূল করছে, কিন্তু বাস্তবে নির্মূল করা হচ্ছে আদিবাসীদের; মাওবাদীদের নয়।

এই পুরস্কারের অর্থ কি জনগণের অর্থ নয়? এর হিসাব কোথায়? কে এই অর্থ বরাদ্দ করে? কে এর নিরীক্ষা করে? কোথায় এটি করা হয়? আমি প্রস্তুত এই তথ্য বের করার জন্য। কিন্তু যদি আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য কোনও আবেদন করি, তাহলে আমাকে নকশাল আখ্যা দিয়ে হত্যা করা হবে বা জেলে পাঠানো হবে। কিন্তু আমরা মরতে বা জেলে যেতে ভয় পাই না। কারণ আমাদের লড়াই আমাদের বনভূমির জন্য, মানবতার জন্য।

আমি পড়েছি যে একটি ২,৫০০ জনের ব্যাটালিয়ন বস্তারে আনা হচ্ছে সেখানে শিবির খোলার জন্য। আকাশ থেকে নজরদারির উদ্দেশ্যে আন্ডার ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার, আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল এবং ড্রোনের মতো নতুন অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সমস্ত কার্যকলাপ কীভাবে গ্রামের মানুষদের জীবনকে ব্যাহত করে?

গ্রামবাসীরা ঘুমোতে পারছেন না। সেনাশিবির স্থাপনের পর, সেনাকর্মীরা গ্রামগুলিতে হামলা চালাচ্ছেন। আদিবাসী চাষিরা মাঠে যেতে পারছেন না, জল আনতে, জ্বালানি কাঠ বা তেঁতুলপাতা সংগ্রহ করতে পারছেন না। বিজাপুরে এই মুহূর্তে এটাই বাস্তব অবস্থা।

আমি সেদিন রাতটা কাটাচ্ছিলাম সিলগরের ওপারে এক গ্রামে। রাত একটার দিকে বোমার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। আমার সঙ্গে ছিলেন এক গর্ভবতী নারী, তিনি বললেন, এই ধরনের বিস্ফোরণ তো এখানে প্রতিদিনের ঘটনা; এমনকি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানও এই আওয়াজে কেঁপে ওঠে। তিনি আমাকে তাঁর পেটের ওপর হাত রাখতে বললেন, তাহলে আমি টের পাব সন্তানটি কীভাবে ছটফট করছে। পরিবেশ ও জমির ওপর সেই বোমাবর্ষণের প্রভাবের ছবি ও ভিডিও আছে আমার কাছে। শুধু মানুষ নয়, এইভাবে পরিবেশকেও হত্যা করা হচ্ছে। তাই এই বিষয়টা শুধুমাত্র আমাদের নয়, গোটা দেশেরই গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

এই এলাকায় আধাসেনার এমন ছড়াছড়ি কেন? এত সংখ্যক বাহিনীর আদৌ কি প্রয়োজন আছে? সরকার কেন আলোচনায় বসছে না? মাওবাদীদের সঙ্গে কথা বলার আগে কেন বস্তারের মানুষদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে না? সরকার এই আলোচনা কিছুতেই স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে চায় না; সেটাই আসল সমস্যা।

যেদিন রাষ্ট্র এই টাকার বন্টন বন্ধ করবে, সেদিনই আদিবাসীদের ওপর চলা এই নির্যাতনও থেমে যাবে। আপনি বিশ্বাস করবেন না; মানুষের লাশ পড়ে আছে চারদিকে আইতু, যার মাথার দাম ৪ লক্ষ টাকা; হিদমা, ৩ লক্ষ টাকা; যোগা, ২ লক্ষ টাকা। এদের মেরে ফেলার পর আধাসেনারা নাচে; ডিজে আনে, সাউন্ডবক্স বাজায়, উৎসব করে। কেন? কারণ এটা টাকার খেলা।

এটা অত্যন্ত ভয়াবহ। ভারতে সাধারণভাবে মনে করা হয়, সেনা দেশরক্ষার কাজ করে। অথচ এখানে সেনারাই আমাদের দেশের মানুষদের হত্যা করছে আর তা উদযাপন করছে। কিন্তু এই খবর বস্তারের বাইরের মানুষ জানতেই পারছেন না। আর শুধু হত্যা নয়; নারী ও শিশুরাও তো হামলার শিকার হচ্ছেন, তাই না?

শিশুরাও গুলির শিকার হচ্ছে। ইন্দ্রাবতী নদীর এলাকার চারটি শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছে; আমাদের কাছে তার প্রমাণ আছে। একটি শিশুর বয়স ছিল আনুমানিক এক বছর; মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছিল সে তখনও। আধাসামরিক বাহিনী যখন গ্রামে পৌঁছয়, তখন শিশুটির বাবা তাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যান। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যদি শিশুটা কেঁদে ওঠে, তাহলে তিনি ধরা পড়ে যাবেন। তিনি শিশুকে নিয়ে লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু তবুও তাঁকে ধরে হত্যা করা হয়। শিশুটিকে নিয়ে সৈন্যরা অন্য এক গ্রামে নিয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষের হাতে তুলে দেয়। তারপর আমি একটি ফোন পাই; একটি শিশু ছটফট করছে, তার মাকে খুঁজছে, কারণ তার বুকের দুধ চাই।

যখন আমরা সেই শিশুদের সঙ্গে দেখা করি, যারা আধাসামরিক বাহিনীর অভিযানের সময় আহত হয়েছিল, তখন দেখেছি; ওদের ক্ষতবিক্ষত ঘায়ে পোকা ধরে গেছে। আধাসামরিক বাহিনী যখন 'এনকাউন্টার' করে, তখন মৃতদেহটি ক্যাম্পে নিয়ে আসে, যাতে পুরস্কারের টাকা তোলা যায়। কিন্তু যদি গুলি শিশুদের গায়ে লাগে, তাহলে তাদের ক্যাম্পে আনা হয় না; কারণ ওদের শরীরে গুলি লাগলে কোনও টাকা মেলে না।

তাহলে প্রশ্ন হল; নারী, শিশু বা বৃদ্ধদের গায়ে 'ভুল করে' গুলি লাগলেও, কেন তার কোনও তদন্ত হয় না? কেন কোনও প্রশ্ন তোলা হয় না?

ওরা শিশুদের মরতে ফেলে রেখে যায়, আর এই সব খবর চুপচাপ চাপা পড়ে যায়। যখন ওদের মুখোমুখি প্রশ্ন করা হয়, তখন বলে; শিশুরা 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছে। কিন্তু আপনিও তো একজন অভিভাবক, আপনারও সন্তান আছে; তাদের জীবন যদি আপনার কাছে মূল্যবান হয়, তবে এদের জীবন কেন নয়?

সমস্যা হল; এই শিশুরা আদিবাসী। তাই ওদের মৃত্যু যেন কারও গায়ে লাগে না। ওদের জীবন যেন মূল্যহীন।

আইন অনুযায়ী স্পষ্ট নিয়ম রয়েছে; যদি কোনও পুলিশ সদস্য কোনও মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে, তবে তাঁকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে চলতে হয়। কিন্তু এখানে সে-সব নিয়ম মানা হয় না।

সকাল সকাল আধাসামরিক বাহিনী গ্রামের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে, যখন মহিলারা ধান ঝাড়ছেন, কাপড় কাচছেন কিংবা ঘরের কাজে ব্যস্ত আছেন। ওরা মহিলাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয়, শাড়ি খুলে ফেলে, নিগ্রহ করে, ধর্ষণের চেষ্টা করে। এমন অজস্র ঘটনা ঘটেছে।

সুধার ঘটনাটা দেখুন; তাঁকে আধাসামরিক বাহিনী তাঁর নিজের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়। গ্রামের অন্য মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের অনুরোধ করেন; যদি অপরাধ করে থাকে তবে মামলা করুন, কিন্তু দয়া করে ওঁকে নিয়ে যাবেন না। কিন্তু তারা কিছুই শোনেনি।

তাঁকে বাড়ির খুব কাছের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে, যতক্ষণ না তাঁর মৃত্যু হচ্ছে বারংবার ধর্ষণ করে যাওয়া হয়। একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। যখন তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তখন বলা হল; একজন নকশালকে এনকাউন্টার করা হয়েছে।

ওঁর দেহটি দান্তেওয়াড়ার হাসপাতালে আনা হয়। আমাকে বলা হল, তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে। আমি কর্তব্যরত চিকিৎসককে বললাম, দেহটা দেখতে চাই। দেখলাম, দেহের কোথাও একটাও গুলির চিহ্ন নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনারা যদি বলছেন এটা এনকাউন্টার, তাহলে কোনও গুলির চিহ্ন নেই কেন?''

বস্তারের মহিলারা আমাকে বলেন; ''সোনি দিদি, আমরা মরার ভয় করি না। আমাদের ওপর গুলি চালাও, আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের ধর্ষণ কোরো না। আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু ধর্ষণের যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি নই। কারণ এখানে ধর্ষণই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস।''

নারীদের জীবন্ত অবস্থায় নির্যাতন করা হয়, নিগ্রহ করা হয়, আঁচড়ানো হয়, ধর্ষণ করা হয়; তারপর গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি কত নারীর ফুলে-ওঠা ও ক্ষতবিক্ষত গোপনাঙ্গ দেখেছি! কত নারীর জখম ও ফুলে-ওঠা উরু দেখেছি!

এই ঘটনা প্রতিদিন ঘটে বস্তারে। কিন্তু এসব কথা কেউ মুখ খুলে বললে, তাঁকে মাওবাদী বলে দেগে দেওয়া হয়। মানুষকে নির্মমভাবে পেটানো হয়, তাঁদের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়। এক নারী আমাকে বলেছিলেন, জীবন্ত অবস্থায় তাঁর স্বামী, ছেলে, ভাই; তাঁদের গোপনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল। এখানে নারী, শিশু, ভাই, পিতা, জঙ্গল, পশু, পাখি; কিছুই নিরাপদ নয়।

ওরা গুলি চালায়, নারীদের ধর্ষণ করে; কারণ যাতে মানুষ এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। সালওয়া জুডুমের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে গিয়েছিল ওয়ারাঙ্গলে। আজ যা হচ্ছে, সেটাও সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে; এই ভূমি খালি করে দেওয়ার জন্য। আর এই জমি খালি হলেই, তা তুলে দেওয়া হবে ওদের পছন্দের বড় পুঁজিপতিদের হাতে।

আমি যখন দুই বছর আগে বস্তারে এসেছিলাম, তখন দেখেছি; মানুষ পানীয় জল পায় না, বিদ্যুৎ নেই। স্কুল আর হাসপাতাল তো বহু দূরের ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেখানে তৈরি হচ্ছে বিশাল রাস্তা; আট লেনের হাইওয়ের মতো দেখতে। আধাসামরিক বাহিনী নিজেদের অনলাইন প্রচারে বলছে, তারা যে শিবির তৈরি করছে, সেগুলো আসলে 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'; যেখানে থাকবে ব্যাঙ্ক, রেশন দোকান (PDS), আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল আর হাসপাতাল। অথচ, এই সমস্ত সেবা দেওয়ার দায়িত্ব তো সরকারের। তাহলে আধাসামরিক বাহিনী এগুলো করছে কেন? আপনি কীভাবে দেখেন এই ঘটনাকে? এই শিবিরগুলি তৈরির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

যেখানে গ্রামসভা আছে, যেখানে একজন সরপঞ্চ ও একজন সচিব আছেন; আইন অনুসারে তাঁরাই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী; সেখানে আধাসামরিক বাহিনী রাস্তা তৈরি করছে কেন? আমাদের এমন রাস্তা দিন, যা দিয়ে আমাদের সন্তানরা স্কুলে যেতে পারবে আর ফিরতে পারবে; আমরা বাজারে যেতে পারব আর ফিরতে পারব। কিন্তু এই বড় বড় রাস্তা তো জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য বানানো হচ্ছে না। এই রাস্তাগুলো তৈরি হচ্ছে খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ পাহাড়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ার জন্য। পাহাড় থেকে খনিজ উত্তোলন করার পর, সেগুলিকে এই বড় রাস্তার মাধ্যমে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার বা অমিত শাহ কি লিখিতভাবে দিতে পারেন যে আদিবাসীদের এক টুকরো জমিও কাড়া হবে না? কোনও খনন চলবে না? জমিকে ছিবড়ে করা হবে না? পরিবেশ ধ্বংস করা হবে না? আমি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত, বস্তারের সমস্ত আদিবাসীদের একত্রিত করব, এমনকি মাওবাদীদের সঙ্গেও কথা বলব। কিন্তু তার আগে সরকার যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলে; এই নিশ্চয়তা দিয়ে যে আদিবাসীদের এক ইঞ্চি জমিও কেড়ে নেওয়া হবে না।

সব অত্যাচারই ঘটানো হচ্ছে 'উন্নয়ন'-এর নামে। আপনি এই তথাকথিত 'উন্নয়ন-আলোচনার' (development discourse) বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

আমরা কোম্পানির বিরোধিতা করি। যেমন ধরুন, NMDC (ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন); এটি একটি সরকার অধিগৃহীত সংস্থা; গত ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকায় খনন চালিয়ে আসছে। আমরা ভেবেছিলাম এতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভালো হবে; আমাদের লোকেরা চাকরি পাবে, হাসপাতাল-স্কুল হবে; সকলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে। আজকে পাহাড়গুলো ফোঁপড়া হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই পাহাড়ের নীচে বাস করেন, তাঁদের লাল, বিষাক্ত জল খেতে হচ্ছে; যেটা বেরিয়ে আসছে লোহার খনির কারণে। শিশুরা মারা যাচ্ছে, কৃষিজমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আজ কোনওরকমে বন থেকে আনা টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করে বেঁচে আছে। খনিশিল্প যদি এমনটাই করে, তাহলে মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে না কেন, বলুন?

পিদিয়াতে কোনও স্কুল নেই। ওরা বলবে মাওবাদীরা স্কুল বানাতে দিচ্ছে না। কোনও হাসপাতাল নেই। ওরা বলবে মাওবাদীরা হাসপাতাল বানাতে দিচ্ছে না। লোকেদের জমির শংসাপত্র নেই। ওরা এটাও বলবে মাওবাদীরা সেই শংসাপত্র দিতে দিচ্ছে না। অঙ্গনওয়াড়ি নেই। সেটাও মাওবাদীরা করতে দিচ্ছে না। কোনও রাস্তায়, গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। ওরা আবারও বলবে, মাওবাদীরা বিদ্যুতের খুঁটি বসাতে দিচ্ছে না।

গ্রামের সমস্ত রাস্তা বাঁধাতে হবে। বিদ্যুতের সংযোগ থাকবে, হাসপাতাল থাকবে, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে, থাকবে শিশুদের জন্য সবরকম সুযোগসুবিধা। উন্নয়নের এই হল সূচনাবিন্দু। এগুলি সব হওয়ার পরেই কেবলমাত্র বড় সড়কের কথা আসতে পারে। অথচ ওরা কেবল বড় সড়কের কথাই বলে।

যখন মুকেশ চন্দ্রকারের মতো সাংবাদিক রাস্তার ইস্যু তুলেছিলেন, তখন তাঁকে খুন করা হল।তাঁকে কি আপনি উন্নয়নের বিরোধী বলবেন? যারা সত্যি কথা বলে, তাদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। মুকেশ কেবলমাত্র সত্যিটা সামনে এনেছিলেন।

আমরাও উন্নয়ন চাই, কিন্তু ওরা যে ধরনের উন্নয়নের কথা বলে, সে উন্নয়ন আমরা চাই না। আগে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো দেওয়া হোক। তারপর ওরা উন্নয়ন করুক। কিন্তু তার বদলে ওরা শুধু বড় বড় কোম্পানিগুলোর সেবা করতেই ব্যস্ত।

সত্যজিৎ রায়: এক অনন্য শিল্পীর পাঁচালী

তানভীর মোকাম্মেল

['গত ২ মে ছিল অনন্য সাধারণ চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ১০৪ তম জন্মদিবস। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই বিরল ব্যক্তিত্ব'র চলচ্চিত্র নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের অন্য ধারার চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট পরিচালক ও সাহিত্যিক তানভীর মোকাম্মেল। আমরা নাগরিক পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই— সম্পাদক, নাগরিক]

জীবন এমন হওয়া চাই যেন মৃত্যুর মুহূর্তে বলতে পারা যায় যে, না, আমার জীবন বৃথা যায়নি। এ যুগে সত্যজিৎ রায়ের চেয়ে এ কথা কোন্ বাঙালী বেশি বলতে পারবেন ? ছত্রিশটা ধ্রুপদমানের চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র বিষয়ক তিনটে গ্রন্থ, ছয়টা প্রফেসর শঙ্কু ও সতেরোটা ফেলুদা কাহিনী, দশটা শিশুতোষ গ্রন্থ, চারটে গ্রন্থের অনুবাদ, এ ছাড়া সন্দেশদ পত্রিকা ও অন্যান্য সম্পাদনার কাজ, অসংখ্য বইয়ের প্রচ্ছদশিল্প অঙ্কন, সত্যজিৎ রায়ের কর্মতালিকার কি শেষ আছে ?

প্রতিভা মানেই বহুমুখী। বা একটু ঘুরিয়ে বললে, বহুমুখীনতাই প্রতিভার প্রমাণ। কঁকতো ছবি না বানালেও লেখক হিসেবে বরেণ্য হতেন, বার্গমান নাট্য-পরিচালক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। আর পাশ্চাত্যসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ফেলুদা ও লালমোহন চরিত্র দু'টোর সৃষ্টি বা রে-রোমান টাইপের নির্মাণ, সত্যজিতের বহুমুখীনতাও, কতই না - বৈচিত্র্যময় !

প্রতিভার আরেক বড় লক্ষণ- ধারাবাহিকতা। একটা ভাল ছবি কেউ বানিয়ে ফেলতেও পারেন, কিন্তু একটার পর একটা বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ করা, সৃজনশীলতার এই নির্ঝরতা- এ পিকাসীয়। তবে ভলতেয়ারের ওই বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত যে, প্রতিভা বলে কিছু নেই। প্রতিভা মূলত তিনটে জিনিসের সমষ্টি- পরিশ্রম, পরিশ্রম, আর পরিশ্রম। সত্যজিতের ক্ষেত্রে এই গভীর পরিশ্রমমনস্কতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো দু'টো বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমের যুক্তিবাদী নিষ্ঠা আর জীবনাচারণে উপনিষদীয় শৃঙ্খলা। এই সব মিলিয়েই সত্যজিৎ রায়।

নদীকে যেমন তার জল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, একজন শিল্পীকেও তাঁর শৈলী থেকে আলাদা করা যায় না। শৈলীকে লুকিয়ে রাখাই যে সেরা শৈলী, রায়ের যে কোনো ছবিই তার প্রমাণ। আমরা যারা ছবি নির্মাণের চেষ্টা করছি তারা জানি, দেখতে সহজ হলেও রায়ের প্রতিটা ছবির প্রতিটা দৃশ্যের শটগুলোর পেছনে রয়েছে কী গভীর মেধা ও যন্ত্রের কত জটিল একেকটা সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক।

বাংলা চলচ্চিত্রের বয়স বেশ কয়েক দশক ('বিল্বমঙ্গল' ১৯১৯ ও প্রথম সবাক ছবি 'জামাইষষ্ঠী' ১৯৩১) হলেও চলচ্চিত্র তখন ছিল ক্যামেরা-থিয়েটার মাত্র (দুঃখের বিষয়, আজও প্রায় তাই !)। নাটকের মতই শানিয়ে তোলা সংলাপ, বানিয়ে তোলা কাহিনী, চীৎকৃত অভিনয়ের অতিনাটকীয়তা, গান, সেট—পুরোটাই এই কৃত্রিমতাব . জগৎ। এক সরল বালকের সরল কাহিনী তার সকল সারল্য দিয়ে জমজমাট কৃত্রিম এই জগতটাকে একদিন উল্টে দিল— 'পথেরপাঁচালী'(১৯৫৫)।

ঋজু, টানটান, মেদহীন চিত্রনাট্য রায়ের। বাঙালী মধ্যবিত্তের সহজাত আবেগী নাটুকেপনা ও সেন্টিমেন্টালিজম থেকে তা' একেবারেই মুক্ত। সংলাপের গুণেই চরিত্রটা রূপ পেয়ে যায়। পরে ক্যামেরার অবস্থান, শট্ ডিভিশন, ক্যামেরা কোণ ও লেন্স, সম্পাদনা ও সর্বশেষে আবহসঙ্গীত; এসবের ভেতর দিয়ে এই ঋদ্ধ চিত্রনাট্য পেয়ে যায় এক যথার্থ চিত্রভাষা। অভিনেতা-অভিনেত্রীর চাহনি, মুখের ভঙ্গি, কথার উচ্চারণ বা নীরবতাও, এসবের মাঝে শিল্প কোথায় লুকিয়ে আছে, রায়ের ক্যামেরা তা' জানে- 'চারুলতা'। ওঁর প্রতিটা ছবির সম্পাদনার বয়ন এমন যে তা কোথাও, প্রচলিত কথায় যাকে আমরা বলি, সেই 'ঝুলে পড়ে' না, সংবেদনশীল দর্শকের মনোযোগ এক মুহূর্তের জন্যেও বিক্ষিপ্ত হয় না। এক নৈঃশধের কবি যেন রায়। কাহিনীর চমক নয়, সংলাপ নয়, ক্যামেরার সঠিক কোণটা নির্বাচন, অভিনেতাদের অভিব্যক্তি, কম্পোজিশনের নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়েই খোলা পালে তরতর এগিয়ে চলে ওঁর ছবি।

আর বিষয়বস্তু ? রায়ের বিষয়বস্তু বৈভবে-বৈচিত্র্যে কতই না বিচিত্রগামী। আজ বার্গম্যানও যেখানে শুধুই ওঁর নানা আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা শোনাতে ব্যস্ত, কুরোশাওয়া স্থির মধ্যযুগের সামুরাই জাপানে, সেক্ষেত্রে সত্যজিতের বিষয়বস্তু কতই না বিভিন্নমুখী। রয়েছে পিরিয়ড ফিল্ম-'সতরঞ্জ কে খিলৌড়ী', চেম্বার ফিল্ম-'চারুলতা', ফ্যান্টাসী ছবি-'গুপি গাইন বাঘা বাইন' বা 'হীরক রাজার দেশে', শিশুতোষ ছবি-'সোনার কেল্লা'।

সেই ১৯২৯ সালে মুরারী ভাদুড়ীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন; ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে তার কারণ কোন রূপকার আপন প্রতিভার বলে এই দাসত্ব থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।দ বন্দী রাজকন্যাকে উদ্ধারের মতো সত্যজিৎ রায় এসে যে সেই উদ্ধারকার্যটা ঘটালেন, তা আজ বাঙালী সংস্কৃতির এক গৌরবময় ঘটনা। তবে চলচ্চিত্র ইমেজ বা চিত্রকল্প (রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতে পছন্দ করতেন 'রূপের চলৎপ্রবাহ') সৃষ্টি করবে, গল্প বলা তার কাজ নয়। আর তাঁর এই ন্যারেটিভ গল্প বলার প্রবণতার জন্যে সত্যজিৎ 'টোটাল সিনেমা'র দাবিদারদের কাছ থেকে সমালোচনাও পেয়েছেন। কিন্তু টোটাল থিয়েটার, টোটাল সিনেমা, কোথাও কি সফল হয়েছে? মানুষ সব শিল্পের কাছেই গল্প শুনতে চেয়েছে। অন্য যুগের, অন্য মানুষের গল্প। আসলে তার নিজেরই গল্প ! সত্যজিৎ তাই দেখি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চলচ্চিত্রগুলোতে গল্প বলেছেন—মানুষের গল্প। অপু-দুর্গা-সর্বজয়া-ইন্দিরা-বিমলা- অনঙ্গ বৌয়ের গল্প। বস্তুত সব শিল্পকর্মেই একটা কাহিনী, নিদেনপক্ষে কাহিনীর একটা ইঙ্গিত থাকা

চাই, অন্যথায়তো তা'মানবেতিহাসের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, কোনো পর্যায়েই পড়বে না ! আর তাঁর এই গল্প বলার কারণেই রায়ের ছবিগুলো মূলত সাহিত্যনির্ভর- 'অপুত্রয়ী', 'চারুলতা', 'তিনকন্যা', 'ঘরে বাইরে', 'জন অরণ্য, 'জলসাঘর'। তবে সাহিত্য ছাড়াও ছবি করেছেন রায়- 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'।

আর গল্প বলার ক্ষেত্রে রায় প্লটে বিশ্বাস করেছেন। তবে প্লট অর্থে যেখানে অনেক চলচ্চিত্রকারই বোঝেন কাহিনীর জট, রায়ের ছবি কাহিনীর সেই ঘনঘটা থেকে মুক্ত। খুব কিছু কি ঘটে 'পথের পাঁচালী'-তে ? আসলে চরিত্ররাই মুখ্য। কখনও কখনও মনে হয় টমাস হার্ডি বা জগদীশ গুপ্তের মত এক অনিবার্য্য ঘটনাক্রমে যেন রায়ও বিশ্বাস করছেন, যেমন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় মিস্টার ব্যানার্জীর বিবাহ প্রস্তাব অনিবার্য কারণে বারে বারেই বাধা পড়ায় ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তবে চরিত্ররাই আসলে ঘটনা সৃষ্টি করে, ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ে, আবার সে আবর্ত থেকে মুক্তও হয়। ঘটনা নয়, নিয়তি নয়, মানুষই মূল। এই যে মানুষকে সব কিছুর কেন্দ্রে রাখা, এই শেক্সপীয়ারীয় বৈশিষ্ট্য, রায়ের ছবিকে অমর করবে।

চলচ্চিত্র সময়কে ভাঙতে, গড়তে, এগোতে, পেছাতে পারে- সবচেয়ে প্লাস্টিক আর্ট। তাই সাহিত্যনির্ভর হলেও অপুত্রয়ী হুবহু বিভূতিভূষণের কাহিনী নয়, 'চারুলতা' নয় 'নষ্টনীড়'। ছবির প্রয়োজনে কাহিনীর নির্যাসটাই নেন রায়, খোলসটা নয়। আর পরিবর্তনটা যে সব সময় মাধ্যমজনিত কারণে করেছেন তেমনটাও নয়। বিষয়বস্তুগতভাবেও করেছেন। পরশুরামের গল্পের 'পরশপাথর'-য়ের উকিলকে কেরাণনী বানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার'-য়ের শেষ অংশ পাল্টে নিয়েছেন নিজের মত করে। কতখানি আত্মবিশ্বাসী হলে একজন বাঙালী শিল্পী রবীন্দ্রনাথকেও পাল্টাতে পারেন !

একটা অভিযোগ আসে যে, ছবির বিষয়বস্তু বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে রায় যেন কিছুটা অতীতচারিতার পরিচয় দেন। এটা ঠিক যে, ওঁর কলকাতা ট্রিলজী বা শেষ ছবিগুলো— 'গণশত্রু', 'শাখাপ্রশাখা' বা 'আগন্তুক' বাদে, তাৎক্ষণিক বর্তমানের চেয়ে রায় যেন সাম্প্রতিক অতীতের প্রতিই, ওঁর আগ্রহ বেশী দেখিয়েছেন। আসলে যে কোনো চলচ্চিত্রকারই হয়তো তাঁর ছবির জন্যে সেই যুগটাকেই বেছে নেবেন যার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি গেছেন, কিম্বা অল্প কিছু দিন অতীত হয়েছে যে যুগ। তবে সব সময়েই তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু থেকেছে যে শ্রেণীটাকে তিনি চিনতেন, সেই— বাঙালী মধ্যবিত্ত। এ মধ্যবিত্তকে তিনিনানাভাবেই দেখিয়েছেন।দেখিয়েছেন তার পতনের কদর্যতা;'জন অরণ্য', তার উচ্চাকাঙ্খার সীমাবদ্ধতা- 'সীমাবদ্ধ', তার পলায়নের প্রান্তরেখা- 'অরণ্যের দিনরাত্রি', তার উত্তরণের সম্ভাবনা-'মহানগর'। তবে মধ্যবিত্তের জীবনপ্রবাহের উপরিতলে যে স্বল্পোচ্চার মৃদুতা রয়েছে, বিশেষ করে ব্যক্তি মানবমনের সূক্ষ্ম nuance-গুলো, তা চিত্রভাষায় রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে রায়ের স্বাচ্ছন্দ্য অনন্য। তবে ভায়োলেন্স, হত্যা, যৌনতা বা সরাসরি সংঘাত, যেগুলোও এই অস্থির সময়ে এক ফিলিস্টাইন সমাজের অংশ বিশেষ, সেসব চিত্রায়নে রায়ের স্বাচ্ছ্যন্দ হয়তো সমমাপের হয়।

নাগরিক মধ্যবিত্ত ওঁর milieu হলেও বাংলার গ্রামকে রায়ের চেয়ে বেশি সফলতায় কেই বা পর্দায় তুলে ধরতে পেরেছেন ? ঝাঁকা নিয়ে চিনিবাস মিষ্টিওয়ালা, তার পেছনে দুর্গা, তার পেছনে অপু, সবার পেছনে নেড়ী কুত্তাটা, জলে তাদের বিম্বিত ছায়া- চিরক্ষুধার, চিরসুন্দর বাংলার গ্রাম তার সকল রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্যে এমন একজন শিল্পীর প্রতীক্ষাতেই যেন ছিল। সত্যজিৎ কখনো গ্রামে বাস করেননি, কিন্তু যথার্থ অর্থেই নাগরিক ছিলেন বলেই গ্রাম-বাংলাকে তার সকল সুষমা ও সীমাবদ্ধতাসহ তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

রায়ের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আরেকটা যে জিনিষ বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা' হচ্ছে নারী চরিত্র সৃষ্টি ও তার যথার্থ উপস্থাপনা। কথাসাহিত্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে সমাজবাস্তবতা রচনার সাফল্যের কৌশলটা হচ্ছে যথার্থভাবে নারী চরিত্রগুলো আঁকতে পারা। এক্ষেত্রে রায়ের সাফল্য তুলনাহীন। স্মরণ করুন, সর্বজয়া-ইন্দিরা-দুর্গা-অনঙ্গ বৌ-রতন-মৃন্ময়ী, রায়ের ছবির সেই সব অসংখ্য নারী চরিত্রের কথা। সংবেদনশীল ও গভীর আত্মানুসন্ধানী কিছু নারীও রায় সৃষ্টি করেছেন; চারু (চারুলতা), বিমলা (ঘরে বাইরে), আরতি (মহানগর)। যে দেশে নারী-আগে-নারী- তারপরে মানুষ শরৎচন্দ্রের সেই দুর্ভাগা বঙ্গদেশে সত্যজিতের ছবিতে যে নারী-আগে-মানুষ-তারপরে-নারী হিসেবে এসেছে, এ তাঁর আলোকিত মননেরই প্রতিফলন।

প্রচলিত অর্থে সত্যজিৎ রায়কে অনেকেই হয়তো ইতালীয় নিওরিয়ালিজম আঙ্গিকের একজন পরিচালক বলবেন। হ্যাঁ, নিওরিয়ালিজমের যে সব বৈশিষ্ট্য, প্রামাণ্য বাস্তবতা, ডিটেলস্, আন্তমানবিক সম্পর্ক, মানব-পরিবারের চিত্রায়ন, মানবিক আশাবাদ, এসবই রায়ের ছবিরও বৈশিষ্ট্য। বস্তুত রায়ই নিওরিয়ালিজমকে সবচে' সুদীর্ঘকাল ধারণ করে এসেছেন। যখন ভিসকন্তি, ডি সিকা মৃত বা এ ধারা থেকে অপসৃত, ফেলিনি অবচেতন যৌনতায় আত্মগত মনোজগতকে খুঁজে ফিরেছেন- 'এইট অ্যান্ড হাফ', তখনও রায়, তাঁর শেষ জীবনেও, নিওরিয়ালিজমের সরল গল্প বলার আঙ্গিকে ছবি তৈরি করে গেছেন—'আগন্তুক'। বস্তুত শেষ মহিকনের মত সত্যজিৎ রায়ই বোধহয় বিশ্বচলচ্চিত্রের শেষ নিওরিয়ালিস্ট।

আর শুধু তাই-ই নয়, ব্রেঁসর প্রভাবে নিওরিয়ালিজম যখন কখনো ক্রমশই এক নীরস প্রতীকী বাস্তববাদী ধারায় খুঁজে ফিরেছে জীবনের নির্যাস, রায় তখন এই ধারায় যোগ করেছেন এক মানবিক সুষমা ও লালিত্য—'চারুলতা','অপুরসংসার'। আর এক্ষেত্রে বড়সহায়হয়েছেরায়েরছবির—গীতিময়তা। সত্যজিৎ, যিনি বলতেন;'পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীতের রহস্য সন্ধান করতে করতেই চলচ্চিত্রের সত্য আমার কাছে ধরা পড়ে',মনে করেন যে,চলচ্চিত্রের কাঠামো সাহিত্যের চেয়ে সঙ্গীতের বেশি কাছাকাছি। যেমন

'চারুলতা'র কাঠামো সাহিত্যের চেয়ে যেন সঙ্গীতের বেশী নিকটতর। 'চারুলতা'র কাঠামোটা, ওঁর নিজের ভাষায়— মোজার্টীয়। এই সাঙ্গীতিক কাঠামোবোধের অভাবকেই তিনি চিহ্নিত করেছিলেন প্রাক-'পথেরপাঁচালী' ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক বড় দুর্বলতা হিসেবে। সাঙ্গীতিক এই ছন্দোময় কাঠামোর গড়ন ছাড়াও রায়ের ছবির আবহসঙ্গীত অংশও সর্বদাই শ্রুতিনন্দন, সৌকর্য ও সুষমায় উদাহরণস্থানীয়। 'জলসাঘর', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে'-র সঙ্গীতময়তা বাঙালীর গর্বের বস্তু, এবং 'তিনকন্যা' (১৯৬১) পরবর্তী ছবিগুলোর আবহসঙ্গীত, যা রায় নিজেই করেছেন, প্রমাণ করে যে রবিশঙ্কর বা ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ছাড়াই রায়ের সঙ্গীতচেতনা কত ঋদ্ধ, এবং চলচ্চিত্রে আবহসঙ্গীতের যথার্থ শৈল্পিক প্রয়োগের প্রশ্নে, রায়ের যে কোনো ছবিই, বিশ্বজুড়েই একটা টেক্সট ফিল্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পশ্চিমা মাপে রায়ের ছবির গতি শ্লথ, তবে তা' রায়ের অধিকতর বাস্তববোধেরই পরিচায়ক। কারণ যে সামাজিক আবহটা ওঁর জগৎ সেই বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন বা আবহমান গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের গতি শ্লথই। সময়ের ধারণা সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে ভিন্নতর হয়। 'ব্রেথলেস' বা 'রেইনম্যান'-য়ে সময়ের যে গতি, 'পথের পাঁচালী' বা 'জলসাঘর'- য়ের সময়ের গতি সেই একই রকম হবে না নিশ্চয়ই। কারণ এদেশে আমাদের সামাজিক জীবনের গতিটাই অনেক ধীরলয়ের।

রায়ের ছবির আরেক বৈশিষ্ট্য; সূক্ষ্মতা। ক্লোজ আপে চারুর চাহনি, দুর্গার মৃত্যুর পর পুকুরঘাটে দাঁত মাজতে মাজতে অপুর থমকে যাওয়া, এইসব অতি সূক্ষ্মকাজ, রে-টাচ্, মানবমনের অন্তঃস্থিত অনুভুতিকে তুলে ধরে এক শিল্পিত প্রগাঢ়তায়। যে সহজ দক্ষতায় রায় 'চারুলতা'-র ত্রিভুজ সম্পর্ক বা 'অপরাজিত'- তে মা ও ছেলের আন্তমানবিক সম্পর্ককে এঁকেছেন, তা সূক্ষ্মতায়;চেখভীয়ই। তাই এটা আমাদের খুব বিস্মিত করে না যে, পশ্চিমা কোনো কোনো সমালোচক রায়কে, 'চলচ্চিত্রের চেখভ' বলতে পছন্দ করেছেন।

জীবনধর্মী ছোটখাটো সংলাপ রায়ের। ''ফিরিয়ে-দাও-আমার-হারিয়ে-যাওয়া-বারটি-বছর' জাতীয় নাটকীয় সংলাপের কৃত্রিমতা থেকে রায় বাংলা চলচ্চিত্রকে কতই না বাস্তবনিষ্ঠ করেছেন। চলচ্চিত্রে সংলাপ functional— কথা মূলত ক্যামেরাই বলবে; সংলাপ সেটুকুই এবং সেভাবেই থাকা উচিত যেভাবে আমরা বাস্তব জীবনে কথা বলি। অপুত্রয়ীতে হয়তো বিভূতিভূষণের সংলাপদক্ষতা ওঁকে সাহায্য করেছে, কিন্তু অন্যত্র ওঁর ছবির সংলাপ সত্যজিৎ রায় নিজেই লিখেছেন, যা বাস্তবনিষ্ঠ ও চরিত্রানুগ।

রায়ের ছবির এক বড় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিরকালই বিবেচিত হবে ওঁর অসীম ডিটেল্স-অন্বেষা। এ ডিটেল্স হতে পারে 'পথের পাঁচালী'-র ছেঁড়া চাদর, ইন্দিরা ঠাকরুনের টোল খাওয়া ঘটি থেকে 'চারুলতা' ও 'ঘরে বাইরে'-র ইঙ্গবঙ্গ-ভিক্টোরীয় আসবাবপত্রের হাজারো অনুষঙ্গ। ডিটেল্সের প্রতি এই গভীর আনুগত্য, এ ভারতীয় ঐতিহ্য। রায় নিজেই 'মহাভারত'- কে ডিটেলসের এক 'স্বর্ণখনি বিশেষ' বলেছেন। মোগল-রাজপুত মিনিয়েচোর আর্ট, নন্দলালের ফ্রেসকো বা অবন ঠাকুরের ছবি; এসবই তো ডিটেল্সের কাজ। সত্যজিৎ যে বিমূর্ততার পথে না যেয়ে ডিটেল্সের মাধ্যমে মানবপ্রকৃতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, এটা ওঁর শৈল্পিক উত্তরাধিকারের মধ্যেই ছিল।

শৃঙ্খলা ছাড়া মহৎ শিল্প সম্ভব কি? রায়ের শৃঙ্খলাবোধ, কী জীবনযাপনে, কী শিল্পসৃষ্টিতে- অনন্য। আর এই শৃঙ্খলাবোধ থেকেই উৎসারিত পরিমিতিবোধ। কতটুকু বলা আর কতটুকু অব্যক্ত রাখা, এর সফল রসায়নের উপরই নির্ভর করে যে কোনো সৃষ্টির শিল্প-সম্ভাবনা। আর এই বলা, ইঙ্গিতে বলা বা অব্যক্ত রাখা, এক্ষেত্রে রায় কখনও ব্যবহার করেছেন Mis-en-scene-'পথের পাঁচালী'-র পুঁতির-মালা-চুরির পরের উঠোনের অসামান্য Mis-en-scene--টার কথা স্মরণ করুন! আবার কখনও বা সরাসরি ডকুমেন্টেশন, প্রামাণ্যচিত্রের আঙ্গিকে- 'অপরাজিত'-র পথদৃশ্যগুলো।

পাঠশালায় প্রসন্ন মুদি পন্ডিতের শ্রুতিলিখনে, চারুর অপেরা গ্লাস দিয়ে পথচারী দেখায়, 'সমাপ্তি'-তে শহুরে বাবুর গ্রামের কাদাপথে হোঁচট খাওয়ায়, দুর্গাদের বনভোজনের কলহে, অপুর কলেজের ক্লাসরুমে কিম্বা গুপী-বাঘার নানা তেলেসমাতি কান্ডে, শিল্পিত কৌতুকবোধ রায়ের ছবির আরেক সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া ভারী সুন্দর একটা স্বাস্থ্যকর কৌতুকদৃষ্টি প্রায়শই ছড়িয়ে থাকে রায়ের চিত্রনাট্যগুলোতে, কখনও সংলাপে, কখনও কোনো চরিত্রের শারীরিক ভাষা বা ভঙ্গিমায়, কখনো বা নাট্য পরিস্থিতিতে।

তবে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পসম্ভার সম্পর্কে যে কোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ রবে, যদি ওঁর সৃষ্টিতে একটা উপাদানের কথা অনুল্লেখ রাখি। তা' হ'চ্ছে; প্রকৃতি। সত্যজিৎ ওই যে শান্তিনিকেতনে আড়াই বছর ছিলেন নন্দলালের ছাত্র হয়ে; প্রকৃতিকে তার নিজস্ব উদ্ভাসে দেখা ও দেখাবার চোখ তিনি তখনই রপ্ত করেছেন। পরবর্তীতে রেনোয়াঁও হয়তো প্রভাবিত করেছেন। রায়ের ছবিতে প্রকৃতি প্রায়শই একটা চরিত্রই; 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'অশনি সংকেত', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং 'পথের পাঁচালী'-তে তো বটেই। তার বুকে অনুষ্ঠিত মানব জীবননাট্যে প্রকৃতিও যেন অংশ নেয়। হরিহরের চিঠি এলে জলপোকারাও আনন্দে নাচে, কাঞ্চনজঙ্ঘা তার অনন্য সৌন্দর্য দেখা থেকে তাকেই বঞ্চিত রাখে, অহং আর ফিলিস্টাইনিজম, মানববেদনাকে দেখবার চোখ যার নষ্ট করেছে।

'আমি মানুষের প্রতি কমিটেড। আর আমি মনে করি সেটাই বড় কমিটমেন্টদ- বলেন রায়। বাঙালী মধ্যবিত্তের অতিরিক্ত রাজনীতিমনস্কতা, সহজাত নাটুকেপনা, দলসর্বস্বতা ও জোলো সেন্টিমেন্টালিজমের অনেক উর্ধ্বে পরিশীলিত ও যুক্তিবাদী মনন রায়ের।' আমার নিজের অনুভূতি হ'চ্ছে মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। ... অবশ্যই প্রাণের শুরুর ব্যাপারটা নিয়ে রহস্য আছেই ... কিন্তু আমার মনে হয় ঈশ্বর তেমন কিছু একটা ব্যাপার নয় যাতে আমি

বিশ্বাস করতে পারিদ; বলেন রায়। বিভূতিভূষণের কিছুটা মিস্টিক অপু কাহিনীকে সত্যজিৎ যেভাবে সেই বিশেষ সময়কালের সমাজবাস্তবতার শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়েছেন, তা' তাঁর আধুনিক মননেরই প্রকাশ। মায়ের শ্রাদ্ধের প্রশ্নে যে আবেগহীনভাবে অপু বলে তসব কালীঘাটে সেরে নেবদ, ধর্ম সম্পর্কে এরকম সংস্কারবিহীনতাই যেন সত্যজিতের বিশ্বাসের জগৎ। ধর্মের সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা সামাজিক 'ট্যাবু' আছে এই উপমহাদেশের শিল্পীদের উপর। সত্যজিৎ তা' দৃঢ় পায়ে অতিক্রম করেছেন, 'দেবী' -তে। সেই ১৯৬০ সালে!

তবে রায় বিশ্বাস করেন তবিদ্রোহই আধুনিকত্বের একমাত্র সংজ্ঞা নয়দ। ফলে দেখি পদ্ধতির পরিবর্তনের চেয়ে ব্যক্তিমনের পরিবর্তনের উপরই যেন ভরসা করেছেন বেশি। 'পথের পাঁচালী'র শেষে দজ্জাল মুখুজ্যে বৌও হরিহরের বিদায়ী পরিবারটার জন্যে কিছু ফল নিয়ে আসে, 'হীরক রাজার দেশে'-র রাজা নিজেও মূর্তিভাঙ্গাদের দড়ি-ধরে-মার-টানের দলে যোগ দেয়।

তবে যে প্রশ্নে সত্যজিৎ ওঁর আবেগকে চাপা রাখেননি, তা' হ'চ্ছে; স্বদেশপ্রেম। মনসাপোতা স্কুলে ইন্সপেক্টরের সামনে বালক অপু যখন আবৃত্তি করছিল; 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চেয়ে সবুজ / সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলারে' তখন ওই উদ্দীপ্ত বালকের আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তিনি যেন সকল বাঙালীর স্বদেশপ্রেমের আবেগটাই তুলে ধরলেন।

গ্রাম-বাংলার বর্ষাভেজা মাটির পথ, বৃষ্টির ধারা, বাঁশবনের শ্যামল ছায়া, ডোবা, এতো শুধু বিভূতিভূষণের নিশ্চিন্দিপুর নয়, 'তিন কন্যা'-সহ রায়ের অন্য সব ছবিতেই বাংলা তার সকল সৌন্দর্য ও স্বরূপ নিয়েই উপস্থিত। আর সেই রূপের গর্বে বলীয়ান হয়েই যেন গুপী-বাঘা ভিন্দেশের মহারাজার দরাবারে গান গেয়ে ওঠে; অমহারাজা তোমারে সেলাম/ আমরা বাংলাদেশ থেকে এলামদ। 'অপুর সংসার'-য়ে লং শটে নৌকায় অপু আর পুলু চলেছে খুলনায়। অপুর হাতে বাঁশী। সাউন্ডট্রাকে সে সময় যেন অনিবার্যভাবেই ভেসে আসে কী সুমধুর তআমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি !দ বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিল অপু। সর্বজয়াও। কিন্তু আবার ফিরেও এসেছিল। ফিরে আসতে হয়। কী যেন আছে বাংলার মাটিতে!

সর্বজয়া কাশী থেকে ফিরছে। বিহারের রুক্ষ প্রান্তর পেরিয়ে ট্রেন ঢুকল বাংলার শ্যামলিমায়। সর্বজয়ার মুখে স্মিত হাসির ছোঁয়া। সাউন্ডট্রাকে তখনই এক leit-motif হয়ে ফের বেজে ওঠে 'পথের পাঁচালী'-র সেই অনবদ্য থীম মিউজিকটা, যা বাঙালী মাত্রেরই বুকে জাগিয়ে তুলে শিরশির এক আবেগের অনুভূতি। 'দুই বিঘা জমি'র উপেনই স্বদেশে ফিরছে যেন; 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি...' সত্যজিৎ রায় আমাদের স্বদেশপ্রেমও শিখিয়েছেন।

ডোবার পানা চারদিক থেকে এসে ঢেকে দিয়েছিল দিদির চুরির লজ্জা, কিন্তু পুরোটা ঢাকেনি। জীবনের স্মৃতির ভান্ডারে কিছু ফাঁক থাকে যে প্রিজমে শিল্পী স্থাপন করেন তার ক্যামেরা। তবে গরুর গাড়ীর চাকা এগিয়েই চলে। জীবনের নিজস্ব প্রবাহমানতায়। সেই উপনিষদীয় চরৈবেতির জীবনদর্শনই যেন রায়েরও। 'পথের পাঁচালী'তে পরিবারটা পথে বেরিয়ে পড়ে, 'অপরাজিত'য় কাশী-রেলগাড়ী-মনসাপোতা-কলকাতা, 'অপুর সংসার' শেষই হয়েছে অনিকেত পথযাত্রার অর্থবহ এক অন্তিম শটে। 'অশনি সংকেত'-য়েও গঙ্গাচরণ-অনঙ্গবৌ বেরিয়ে পড়েছিল সনাতনী আশ্রয় ছেড়ে, হরিহরপুর থেকে বাসুদেবপুর হয়ে ভাতছালা থেকে নতুনগাঁও। পথেই রয়েছে মুক্তি। পথ ও পথিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র গানগুলোর সংখ্যাই স্মরণ করুন। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল-চরৈবেতি! ভারতীয় জীবনদর্শনের এই প্রবাহমান গতিশীলতারই আরেক সার্থক উত্তরসূরি যেন—সত্যজিৎরায়।

শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের একটা দ্বৈততা রয়েছে, বিষয়ে দেশজ, আঙ্গিকে আন্তর্জাতিক। ফলে কোনো দেশীয় সংস্কৃতিকে যথার্থ তুলে ধরতে সেই চলচ্চিত্রকারই সবচে' বেশি সফল হন, যাঁর পা স্বদেশের মাটিতে দৃঢ়, কিন্তু দৃষ্টি বিশাল বিশ্বে প্রসারিত। সত্যজিৎ রায়ের মত।

দৃশ্য-শ্রাব্যগত মাধ্যমের এই দিগ্বিজয়ী যুগে মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রচার সীমাবদ্ধতা যত বাড়ছে, ততই আমরা বুঝতে পারছি সত্যজিতের ছবি বাঙালীকে বিশ্বে পরিচিত ও গর্বিত করতে কত বড় ভূমিকা রাখছে। তবে সত্যজিৎ রায়কে পশ্চিমারা যে অঞ্জলি ভরে পুরস্কার দিয়েছেন, সেটা ওঁর ছবি exotic কিছু সে কারণে নয়। কারণ হচ্ছে ওঁর ছবির গভীর মানবিক আবেদন ও মাধ্যমটার উপর ওঁর অসামান্য দখল। মনে রাখতে হবে সত্যজিৎ ওঁর শিল্পনিপুণ ছবিগুলো টালিগঞ্জ স্টুডিওর মান্ধাতা আমলের সব যন্ত্রপাতি দিয়েই বানিয়েছিলেন। তবে যেটা দুঃখজনক যে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবজাত জোলো ভক্তিবাদের কারণে সত্যজিতের ছবির একটা নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন বাংলা ভাষায় আজো তেমন গড়ে উঠল না (চিদানন্দ দাশগুপ্ত বা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এরকম দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া)। এখনও সত্যজিতের ছবির সেরা মূল্যায়নকারী শুধু নয়, সেরা ব্যাখ্যাকারেরাও পশ্চিমা—মারী সিটন,রবিন উড,পলিনকেলবা অ্যান্ড্রু রবিনসন। আসলেযেদেশেচলচ্চিত্র সমালোচকরা এই নব্বইয়ের দশকে এসেও (যে দশকে চলচ্চিত্র শতায়ু হো'ল) চলচ্চিত্রকে 'বই' মনে করেন, চলচ্চিত্রের চিত্রভাষা সম্পর্কে জানেন সামান্যই, ছাপানো কাহিনী বা উপন্যাসটার সঙ্গেই শুধু তুলনা করেন চলচ্চিত্রটার, সেরকম মফস্বলী এক সংস্কৃতিতে সত্যজিতের মত এত বড় মাপের একজন চলচ্চিত্রকার সৃষ্টি হো'ল কী ভাবে, তা' শিল্পের জগতের এক অষ্টম আশ্চর্যই!

আর শুধু চলচ্চিত্র কেন, লেখক রায় ? কিছু ভক্তিবাদী প্রশস্তি ছাড়া রায়ের লেখালেখিরও কি কোনো যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে? কিম্বা গ্রাফিক শিল্পী রায়ের? কমার্শিয়াল আর্টও যে একটা আর্ট, বিজ্ঞাপনের কাজে সেই তরুণ বয়সেই তো তা' প্রমাণ করেছিলেন। কমার্শিয়াল আর্টে উডকাট, লিনোকাট আর পেপারকাটের কী অসামান্য ব্যবহারই না সত্যজিৎ রায় করেছিলেন ? কিম্বা, প্রচ্ছদ শিল্পী রায়ের? থাক, আমাদের বেদনার বারমাস্যা বাড়িয়ে আর লাভ নেই!

সেরা বাঙালী তাঁরাই হতে পেরেছেন যাঁরা পুর্ব ও পশ্চিমের সেরা দিকগুলো আত্মস্থ করেছেন- রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, এবং—সত্যজিৎ। যথার্থরেনেসাঁম্যান এঁরা। সত্যজিৎই হয়তো বেঙ্গল রেঁনেসার—শেষ প্রতিভু।

এখন প্রশ্ন সত্যজিতের উত্তরসুরি কারা বা কে ? ঋত্বিকের অনেক সোচ্চার ভক্ত অনুসারী রয়েছেন, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ? ক'জন বাঙালী বা ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের ধারায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন ? বরং আমরা তো দেখছি নানারকম উচ্ছ্বাসময় প্রশস্তি প্রকাশ করে, সত্যজিৎকে সকাল-বিকাল নমস্কার জানিয়ে, তাঁর ছবি নির্মাণের পদ্ধতিকে দূর থেকেই যেন শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে। এ ধরনের দেবত্ব আরোপ বা deification মঙ্গলজনক কিছু নয়, যে ধরনের উচ্ছ্বাসময় গালগল্পের কারণে ঋত্বিকের ছবিরও যথার্থ নৈর্বক্তিক মূল্যায়ন আজো বাংলায় গড়ে উঠল না তেমন।

সত্যজিৎ রায়, যাঁর মানসগঠন পশ্চিমা, সেই আধুনিক রুচিশীল মানুষটার কাছে বাঙালী মধ্যবিত্তের এই ভুলুণ্ঠিত ভক্তিবাদ নিশ্চয়ই ছিল খুব বিব্রতকর। বস্তুত সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তাতেই আছি। যে দেশে রাজনীতিবিদ গান্ধী 'অবতার' বনে যান, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হয়ে পড়েন 'গুরুদেব', সেই ভক্তিমার্গের দেশে এই রকম উঁচু লম্বা শরীর, এ রকম ইংরেজি বলিয়ে-লিখিয়ে, এত বিদেশী পুরস্কার, এই পরিশ্রমী ও সংবেদনশীল চলচ্চিত্র-পরিচালকটাকে বাঙালী আবার না কী বানিয়ে ফেলে! বাঙালী মধ্যবিত্তের মাত্রাজ্ঞানের অভাব তো নতুন নয়। হয়তো একদিন বুঝবে ক্যালেন্ডারের ফ্রেমে শুধু ঝুলিয়ে রাখা নয়, নয় তাঁকে নিয়ে হাঁটুভাঙ্গা প্রশস্তির শত শত পাতা লেখা, যা দিয়ে এই প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালকটার জীবন ও কর্মের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা যায়, তা' হ'চ্ছে সত্যজিতের ছবিগুলো দেখা, এবং বারে বারেই দেখা।

তবে আবার তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তাও নেই। কারণ সর্বপ্রকার রুচির দীনতা ও ফিলিস্টাইনিজমের বিরুদ্ধে আপোসহীন এই মানুষটা তো ছিলেনও একাকী। ওঁর বা ইবসেনের 'গণশত্রু'- র সেই ডঃ স্টকম্যানের মতই, যে স্টকম্যান বলেন; "The strongest man in the world is the man who stands most alone"-ই তো ছিলেন রায়! ওঁর মৃত্যুতে ঘনঘন মূর্ছা যাওয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের জোলো ভক্তিবাদের হৈ-হট্টগোলের ভীড়ে, সকল ধূপের ধোঁয়াকে ছাপিয়েই, তিনি চির উদ্ভাসিত রইবেন। কারণ আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ এই চলচ্চিত্র-পরিচালকটাও ছিলেন তাঁর জীবন ও কর্মে ওই ডাক্তারটার মতই আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক একক যোদ্ধা। বাঙালীর আরো কিছু গণশত্রু প্রয়োজন। সত্যজিৎ রায়ের মত!

'দূষণ-মূল্য' ব্যবহার করে কি জলবায়ু সঙ্কটের সমাধান সম্ভব

রাহুল রায়

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত নানান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি বিষয় বারবার উচ্চারিত হয়, যে সমস্ত দেশ বাতাসে কার্বন নিঃসরণ বেশি করায় ভূ-উষ্ণায়ন বেড়ে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে চলেছে, গ্রহটির এই ক্ষতির দায় তাদের নিতে হবে। এটি সত্য যে ধনী প্রথম বিশ্বের মানুষ তৃতীয় বিশ্বের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি ভোগবাদী জীবনযাপন করে। এই ভোগবাদী যাপন বজায় রাখতে কলকারখানা সহ আরও অন্যান্য উন্নয়নের জন্য বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ বেশি হয়। এ থেকেই দুটি কথার সৃষ্টি হয়েছে; 'পলিউটার টু পে' বা 'দূষণ-মূল্য' নীতি এবং টেকসই উন্নয়ন। বিশ্বজুড়ে টেকসই উন্নয়ন করতে গেলে তৃতীয় বিশ্বে যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়, সেগুলির খোল-নলচে পাল্টে ফেলার কথা নানান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে। এই মোতাবেক উন্নত বিশ্বের দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য অর্থ খরচ করছে। এখানেই একটা প্রশ্ন উঠেছে, ধনী দেশগুলি ইচ্ছেমতো বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করবে আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দূষণ-মূল্য দিয়ে যাবে; এভাবে কি বসুন্ধরাকে রক্ষা করার কোনও সমাধানে আসা যাবে?

নানান সম্মেলনে গৃহীত 'পলিউটার টু পে' প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে জাপান, কানাডা, ব্রিটেন থেকে অর্থ এসেছে। এই অর্থ কলকাতা সহ ভারতের নানান অঞ্চলে দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, কলকাতায় কয়লা-চালিত যে সমস্ত বয়লার ছিল, বিদেশি অর্থে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে খনিজ তেল-চালিত করা হয়েছিল। যাত্রীবাহী সবুজ বাস কেনার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের টাকা আমরা পাচ্ছি। কিন্তু এই বিদেশী অর্থেই কি আমাদের এখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা পুরোপুরি সম্ভব হবে?

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সরকার, সংস্থা এবং ব্যক্তিবিশেষ ভূ-উষ্ণায়ন, চরম আবহাওয়া এবং পরিবেশ বিপর্যয় রুখতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা ও কর্মসূচিতে বিপুল পরিমাণ ডলার ঢালছেন। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, জলবায়ু সংকট সমাধানে আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো? নাকি এক অন্তহীন ব্যয়-চক্রের আবর্তে ঘুরছি, যার কোন স্পষ্ট দিশা দেখা যাচ্ছে না? বিগত দশকে আবিশ্ব বেশ কিছু ট্রিলিয়ন ডলার ঢালা হয়েছে পুনরাবর্তনযোগ্য শক্তি, সবুজ পরিকাঠামো এবং দূষণ হ্রাসে। ২০২৪ সালে দেশগুলি একত্রে পুনরাবর্তনযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ৭৭১ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। 'আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা'-র হিসেব অনুসারে, ২০২৪ সালে পরমাণু এবং অন্যান্য নির্মল শক্তি ক্ষেত্রে আবিশ্ব আরও ৮০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। এর বাইরে জলবায়ু গবেষণা, অভিযোজন কৌশল এবং বিপর্যয়জনিত

ত্রাণ কর্মসূচিতে বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার গিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সাহায্য করতে সিওপি-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৩০০ বিলিয়ন ডলারের এক নতুন জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্যে সম্মত হয়েছে। ওই একই সময়ে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বছরে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার সংগ্রহেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নির্মল (সৌর ও বায়ু) শক্তির উৎপাদন এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরিতে পৃথিবীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং চিন সবচেয়ে বেশি লগ্নি করেছে। কিন্তু এর কোন ফলাফল কি আমরা দেখতে পাচ্ছি?

পৃথিবীতে মানুষ যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, বেশ কিছু জলবায়ু বিশেষজ্ঞ জানাচ্ছেন, জলবায়ু পরিবর্তন তার মধ্যে জটিলতম। সমুদ্রতল বৃদ্ধি, মেরুর বরফ বিগলন, প্রবাল দ্বীপ ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্রের দ্রুত স্থানান্তর, বিধ্বংসী ঝড় ও সুনামি, অভূতপূর্ব তাপপ্রবাহ; পৃথিবীর নানা অঞ্চলকে বিপন্ন করে চলেছে। এই সব পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস মেশা, বিশেষ করে কার্বনডাইঅক্সাইড, যা কয়েক শতক ধরে বায়ুমণ্ডলে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, আমরা যদি আগামীকালই বাতাসে সমস্ত রকম গ্রিনহাউস গ্যাস মেশা বন্ধও করে দিই, তাও এর কুপ্রভাব কয়েক প্রজন্ম ধরে দেখা যাবে। বেশ কিছু 'ক্লাইমেট টিপিং পয়েন্ট'-কে (যেমন, কুমেরুর বরফ বিগলন) এড়ানোর আর উপায় নেই।

এমন এক পরিস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে সামাল দিতে সৌর এবং বায়ু শক্তি আমাদের আগামী ভরসা। বিগত দশকে পৃথিবীতে সৌর প্যানেল-এর দাম প্রায় ৯০ শতাংশ কমায় (বর্তমান খরচ ০.২০ ডলার/ওয়াট) নানান দেশে এর দ্রুত প্রতিষ্ঠাপন হয়েছে। ২০৩০ সালে প্রতি ওয়াট সৌর প্যানেল প্রতিষ্ঠাপনের খরচ আরও কমে ০.০৯৭ ডলার দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন। ২০২৪ সালে সৌরশক্তি উৎপাদনে আবিশ্ব ৫০৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছিল। টেক্সাস, ডেনমার্ক সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বায়ু খামার (উইন্ড ফার্ম) গড়ে উঠেছে। তবুও আবিশ্ব বিদ্যুতের চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ (২০২৩) মেটাতে সক্ষম পুনরাবর্তনযোগ্য শক্তি। আশা করা হচ্ছে ২০৩০ সালে আবিশ্ব বিদ্যুতের চাহিদার ৪৬ শতাংশ মেটাতে পারবে পুনরাবর্তনযোগ্য শক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, যানবাহন, এমনকি গেরস্থালির কাজকর্মও এখনও জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর। এর বড় কারণ, পুনরাবর্তনযোগ্য শক্তির সংরক্ষণ ও গ্রিড নির্ভরযোগ্যতার সমস্যা, বিশেষ করে মেঘলা বা বাতাসহীন দিনে। বর্তমানে উন্নয়নই যেখানে সকল রাষ্ট্রের পাখির চোখ, সেখানে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে সরে আসার অবস্থায় কোন রাষ্ট্রই নেই, আর তা অতি খরচসাপেক্ষও বটে।

আবিশ্ব রকমারি লগ্নি এবং রাষ্ট্রনেতাদের নানা অঙ্গীকার সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গমন বেড়েই চলেছে। উন্নতিশীল দেশগুলির আর্থিক বিকাশ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভরতার জন্য ২০২৩ সালে বাতাসে রেকর্ড পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড (৩৭.৪ গিগাটন) মিশেছে। চিন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত; পৃথিবীর এই তিন বৃহত্তম নির্গমনকারী দেশ তাদের শক্তি-চাহিদা এবং পরিবেশ লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে কঠিন সমস্যার মুখে পড়ছে। ২০২৩ সালে চিন-এর বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১৩.২৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন (আবিশ্ব নির্গমনের ৩০.১ শতাংশ)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ছিল ৪.৬৮ বিলিয়ন মেট্রিক টন (আবিশ্ব নির্গমনের ১১.৩ শতাংশ)। ওই একই বছরে ভারতের কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ছিল ২.৯৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন (আবিশ্ব নির্গমনের ৭.৮ শতাংশ)।

এখানেই একটি প্রশ্ন উঠে আসছে, শুধু প্রযুক্তি দিয়ে কি জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দেওয়া যাবে? না। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আমরা দেখেছি, রাষ্ট্রনেতারা বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন আমূল কমিয়ে আর্থিক বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং জাতীয় স্বার্থ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনেক কথা বলেন। কিন্তু কার্যত কেউ কথা রাখেননি। এ ব্যাপারে প্যারিস চুক্তি আবিশ্ব এক যুগান্তকারী পথ দেখালেও এর প্রয়োগ অতি দুর্বল। ফলত, অগ্রগতি অতি ধীর। বেশ কিছু দেশ তাদের অঙ্গীকার থেকে পিছু হটেছে। আবার কিছু দেশ এ নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবাদে জড়িয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে আবার বাণিজ্য নীতির সঙ্গে জলবায়ু নীতির ঠোকাঠুকি হচ্ছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা তাই স্পষ্ট জানাচ্ছেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া কেবল প্রযুক্তি একা জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দিতে পারবে না।

এখানে উল্লেখ্য, উন্নতিশীল দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে নানান জরুরি সমস্যার মধ্যে একটি হল জলবায়ু পরিবর্তন। এই মানুষগুলির কাছে অগ্রাধিকার পায় নির্মল জল, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধা। বিভিন্ন উন্নতশীল দেশে সস্তার কয়লা এবং খনিজ তেল পুড়িয়ে দেশের বিকাশ জারি রেখে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচানোর চেষ্টা হয়। এদের তাই বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমাতে বলাও অসমীচীন, বিশেষ করে যেখানে পৃথিবীর ধনী দেশগুলোই বৃহত্তম নির্গমনকারী। ধনী দেশগুলির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের অঙ্গীকার এলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। আবিশ্ব ন্যায্যতার এই উভয়সংকট জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দেবার কোন একক সমাধানে বাধা দিচ্ছে। কার্বন বন্দি করার যন্ত্র থেকে জিওইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত প্রযুক্তি আমাদের নানান আশার পথ দেখালেও, বেশ কিছু প্রশ্ন এখানেও উঠছে। আবিশ্ব কার্বন নির্গমনের পরিমাণের সাপেক্ষে তাকে বন্দি করার প্রকল্প খুবই কম। পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার লাফিয়ে বাড়ছে। এসব গাড়ি যে ব্যাটারিতে চলে, সেগুলি তৈরিতে বিরল খনিজ লাগে। এই ব্যাটারি শিল্পকারখানাগুলিও বেশ কিছু দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী আবার পেল্লায় প্রকল্প তৈরি

করে সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে পৃথিবী থেকে দূরে রাখার (সোলার রেডিয়েশন মডিফিকেশন) প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে অজানা কী বিপদ ঘটবে, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। যতক্ষণ না আমরা ভোগবাদী জীবনচর্যা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারছি, কোন বিজ্ঞান-প্রযুক্তিই বসুন্ধরার বিপন্নতা একক হাতে সামাল দিতে অক্ষম।

জলবায়ুর যত পরিবর্তন ঘটছে, আমাদের তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র-প্রাচীর গড়া হচ্ছে। চাষিদের ফসলের ধরন পাল্টে যাচ্ছে। আবিশ্ব মানুষ আরও বেশি বন্যা, দাবানল ও খরার মুখোমুখি হচ্ছে। বিগত ৫০ বছরে আবিশ্ব ১২,০০০ বিপর্যয় ঘটেছে চরম আবহাওয়া, জলবায়ু এবং জল-সম্পর্কিত নানান কারণে। এতে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের প্রাণ গিয়েছে বলে 'ইন্টার গভর্মেন্টাল সায়েন্স-পলিসি প্লাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস নেক্সাস অ্যাসেসমেন্ট' (ডিসেম্বর, ২০২৪) জানিয়েছে। এই সংস্থাটির হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর ১০ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ বিলুপ্ত হওয়ার মুখে।

২০২৪ সাল পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে নথিভুক্ত দশম উষ্ণতম বছর ছিল বলে জানিয়েছে 'বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা'। গোটা বছরেই প্রাক্-শিল্প বিপ্লব অবস্থার উষ্ণতার থেকে আমরা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর (নভেম্বরে ১.৬২ ডিগ্রি সেলসিয়াস) চৌকাঠ পেরিয়েছি। বিমা সংস্থাগুলি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। পৃথিবীর কিছু অঞ্চলকে বিমাযোগ্য নয় বলেও জানাচ্ছে। ফলে সরকারকে বিপর্যয়-পরবর্তী ত্রাণে আরও বেশি টাকা ঢালতে হচ্ছে। অভিযোজনের ফলে জীবন রক্ষা পায় এবং ক্ষয়ক্ষতি কমে, এটা ঠিক। কিন্তু এটি খরচসাপেক্ষ এবং কোথায় এর শেষ, কেউ জানে না। জলবায়ু পরিবর্তনে কিছু অঞ্চল আর বাসযোগ্য নেই। মানুষ সে সব অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর হতে-পারে-গোছের কোন ব্যাপার নয়। এটি সত্য। এটি ঘটছে।

ডলার এবং প্রযুক্তির বাইরে জলবায়ু পরিবর্তনে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে। চরম আবহাওয়াজনিত নানান ঘটনায় বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, বহু পরিবার বাপ-ঠাকুরদার ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়ে অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে। ফলে দুশ্চিন্তায় মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। শিশু এবং দুর্বলমনা মানুষদের ওপরে এর প্রভাব বেশি পড়ছে। কাজ না থাকায় ভুখা মুখের সারি বাড়ছে। এতে অপুষ্টি বাড়ছে। তাপপ্রবাহে শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ২০২৩ সালে আবিশ্ব আর্থিক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২৮০ বিলিয়ন ডলার।

উল্লেখ্য, এর মধ্যে বিমাকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১০৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আবিশ্ব মোট ক্ষয়ক্ষতির প্রায় ৬২ শতাংশই বিমাহীন। এখানে বলার, এই নিয়ে পৃথিবীতে টানা চতুর্থবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিমাকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল। জলবায়ু পরিবর্তনে আর্থিক ক্ষতির হিসেব করা গেলেও মানসিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব বেশ কঠিন।

এখানে মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে, কর্পোরেট সংস্থাগুলির কি করণীয় কিছুই নেই? বেশ কিছু বড় কর্পোরেশন কার্বন-নিরপেক্ষ থাকার অঙ্গীকার করেছে। এরা পুনরাবর্তনযোগ্য শক্তি উৎপাদনে লগ্নি করে শক্তির জোগান-শৃঙ্খলটিকে নয়া রূপদান করার কথাও দিয়েছে। যদিও অতীত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, কেউ কথা রাখেনি। এখনও পৃথিবীর বেশিরভাগ বড় তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলি জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন করে চলেছে।

এ প্রসঙ্গও উঠছে যে, ব্যক্তিগতভাবে গাড়ি কম চালানো, মাংস কম খাওয়া বা পুনরাবর্তনযোগ্য জিনিসপত্রের ব্যবহার গ্রহটিকে বাঁচাতে পারে। বক্তব্যগুলি ঠিক হলেও নানান পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, পদ্ধতিগত রূপান্তর এক্ষেত্রে বেশি জরুরি। কী পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে বা কীভাবে শহরগুলি গড়ে তোলা হবে, এ ব্যাপারে একক মানুষের তেমন করণীয় কিছু নেই। কিন্তু তৃণমূল স্তরের পরিবেশ আন্দোলনের চাপে বৃহদায়তন সংস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে ভাবতে এবং পদক্ষেপ করতে বাধ্য করা যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দিতে বিশ্বজুড়ে এক ছন্দোবদ্ধ টিমওয়ার্ক দরকার। এটি মুখে বলা সহজ হলেও, মাঠে নেমে প্রায় ২০০টি দেশকে এ বিষয়ে মতৈক্যে আনা যথেষ্ট কঠিন। কারণ ধনী ও গরিব দেশ, দ্বীপরাষ্ট্র এবং তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বার্থ ও অগ্রাধিকারের বিষয় আলাদা। নানান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাই অনেক সাহসী ঘোষণা শোনা গেলেও কাজে তার প্রতিফলন দূরবিন দিয়ে দেখতে হয়।

এখানে একটি জরুরি কথা বলা দরকার। দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার থেকে সহসা সরে এলে সেখানকার শিল্প-কারখানা এবং শ্রমিকদের মধ্যেও এক বড় পরিবর্তন ঘটবে। কয়লাখনির মালিক, তেল খননকারী এবং শ্রমিকরা কাজ হারানোর ভয়ে থাকবেন। শক্তির মূল্যবৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক বিকাশ মন্দীভূত হয়ে দেশে নেতিবাচক কোন প্রতিক্রিয়া ঘটার আশঙ্কায় থাকবেন রাজনীতিকরা। সবুজ-শক্তিতে রূপান্তর নতুন কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিলেও তা সময়সাপেক্ষ। অর্থনীতি ও পরিবেশ; দুটির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা বেশ কৌশলী কাজ। স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন ওঠে, আমরা কি তা পারব? প্রকৃতিকে সংরক্ষণ এবং তাকে যতটা সম্ভব পূর্বের অবস্থায় (দূষণমুক্ত) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সামাল দেবার এটি এক অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার বা পদ্ধতি। বনভূমি, জলাভূমি এবং লবণাম্বু উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণ কার্বন শোষণ করে। মানুষকে বন্যা ও ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ব্যাপক বনসৃজন কর্মসূচি একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন বাধা দেবে, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল হবে। এর জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদী সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার রূপায়ন। জন স্কেলস্ আভেরি তাঁর 'ফ্যাসিজম,দেন অ্যান্ডনাও' বই-তে জানাচ্ছেন, এক নিবন্ধে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. অ্যান্ড্রু গ্লিকসন লিখেছেন, ''ট্রেনটি স্টেশন ছেড়েছে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রথমে ২ ডিগ্রি এবং তারপরে ৪ ডিগ্রি

সেলসিয়াসের দিকে এগোচ্ছে, যেমনটি আইপিসিসি (ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অনুমান করেছে।" জার্মানির প্রধান জলবায়ু বিজ্ঞানী জোয়াকিম হ্যান্স শেলন হ্যুবার-এর ভাষায়, 'পৃথিবীর ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ঘটনা সভ্যতার ভাঙনকে সূচিত করেছে।' যদিও বেশিরভাগ প্রধান সংবাদমাধ্যমে একে আমল দেওয়া হচ্ছে না, বা এর গুরুত্বকে তরলীকরণের চেষ্টা চলছে। আর বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলির কাছে জলবায়ু পরিবর্তন আজও ব্রাত্যই থেকে গিয়েছে।

জাতগণনা ইস্যুতে রাহুলের দাবীর কাছে মাথা নত করল মোদী সরকার

অমিতাভ সিংহ

গত কয়েকবছর ধরে যে বিষয়টাকে নিয়ে লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি লড়াই করছিলেন অবশেষ তাতে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। বিষয়টি হল

জাতিগত জনগণনা।

পহেলগামে জঙ্গী আক্রমণের পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজনৈতিক বিষয়ক আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদিও জনগণনার কাজ কবে শুরু হবে তা জানতে পারা না গেলেও জনগণনার সঙ্গে এবার জাতিগণনাও হবে তা ঘোষণা করা হল গত মাসের শেষে। কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলির চাপে সরকার নতিস্বীকার করার কারণ সম্ভবত আসন্ন বিহারের বিধানসভা নির্বাচন। অথচ নরেন্দ্র মোদী সরকার এই জাতিগত জনগণনার বিরুদ্ধে সবসময়ই অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু তখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার সরকার জাতিগণনা করায়।সেখানে দেখা গেল ২১৪ টি জাতির মধ্যে ১৯৭ টি জাতি তপসিলি জাতি ও উপজাতি, ওবিসি ও অতি পশ্চাৎপদ জাতির মধ্যে পরছে। ফলে এই তথ্য বিজেপির ঘুম ছুটিয়ে দেয়। মানুষ মনে করতে পারে যে বিজেপি শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের দল ও পশ্চাৎপদ জাতি বিরোধী এটাই হল তাদের ভয়। অতএব রাহুল গান্ধির কৃতিত্বে ভাগ বসাবার কৌশল হিসাবেই এই সিদ্ধান্ত। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর আমলে যে মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার সময় বর্ণহিন্দুদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আদবানী রথযাত্রা করেছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের দল হিসাবে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা ইদানিং কালে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বই কি। মোদীও বার বার নির্বাচনী প্রচারে নিজেকে ওবিসি বলে পরিচয় দিয়ে ওবিসির ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়েছেন। সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন। তাই ওবিসি বিরোধী ভাবমূর্তি তার পক্ষে ক্ষতিকর যদি সবসময় জাতিগণনার বিরোধিতা করতেই থাকেন। বিশেষ করে রাহুল গান্ধি যখন এই বিশেষ ইস্যুটাকে নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে লড়ে যাচ্ছেন। সুতরাং বলা যায় এই চাপের কাছে মাথা নোয়ানোটা একেবারেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। জনসংখ্যায় পশ্চাৎপদ শতাংশের বিচার করে তাদের জন্য যথাযোগ্য উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়টি একেবারেই গৌণ। এখানেই মোদীর সঙ্গে নেহেরুজি বা ইন্দিরা গান্ধির তফাৎ।

জনগণনা বা সেন্সাস হল এমন একটা সমীক্ষা যেখানে সমীক্ষকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে সেই পরিবারে কতজন মানুষ ও তার মধ্যে নারী পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা,তাদের বয়স,শিক্ষাগত যোগ্যতা, মাতৃভাষা, ধর্ম,জাতি, বিবাহিত কিনা,বাসস্থান ও তা পাকা কিনা,কটা ঘর,দেওয়াল ও ছাদ পাকা না মাটির,মেঝে পাকা নাকি মাটির,ঘরে রেডিও,টিভি, কম্পিউটার, গাড়ী,স্কুটার, সাইকেল, টেলিফোন, মোবাইল আছে কিনা, শৌচাগার, বিদ্যুৎ আছে কিনা,খাবার জল আনতে দূরে যেতে হয় কিনা ইত্যাদি। তপসিলি জাতি ও উপজাতি কিনা।উপজাতি হলে সাঁওতাল, ওরাও বা মুন্ডার মধ্যে কোনটি। এবার জাতগণনায় ওবিসি যুক্ত হবে। মন্ডল কমিশনের সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল ৫২ শতাংশের মত ওবিসি আছে ভারতে। ৩৭৪৩ টি জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।যদিও এই সমীক্ষায় স্যাম্পল সাইজ ছিল মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ।ফলে এই তথ্যকে ধ্রুবসত্য বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর শিক্ষা ও চাকুরিতে সংরক্ষণের দাবী ওঠা অসঙ্গত নয়। ১৯৯২ সালে সুপ্রীম কোর্ট যখন রায় দিয়েছে ওবিসি সংরক্ষণ সংবিধানসম্মত।

১৮৮১ সালে ব্রিটিশ এদেশে প্রথম জনগণনা করেছিল।সেখানে জাতি সম্পর্কে তথ্যও ছিল।১৯৩১ এর সেন্সাসে ৪১৪৭ কাস্ট ও সাবকাস্টের উল্লেখ ছিল।১৯৪১ সালে সেন্সস হলেও তা প্রকাশিত হয়নি যুদ্ধের কারণে।

জাতব্যবস্থা আমাদের দেশে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের ভাষায় 'বিভিন্ন মাত্রায় জাত বিন্যাস যেখানে সেটাই ভারত। কেউ বলতে পারেন এটাই ভারতীয়ত্ব।'

জাতিভেদের উৎস আমরা দেখতে পাই ঋগ্বেদে যা ৩৫০০ বছর আগে বর্ণিত। এখানে চারটি বর্ণ,যেমন ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভাগ করা হয়েছে।প্রতিটি বর্ণের পেশা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।১৯৯০ সালে Anthropological Survey of India বলে দেশে অন্তত ৪৬৩৫ টি বিভিন্ন জাতি আছে যারা সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রায় একে ওপরের থেকে পৃথক।

মনুস্মৃতি ধর্মগ্রন্থে আরো কঠোরভাবে এইসব জাতির পেশাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ইশ্বরের নামে। প্রতিটি জাতের সামাজিক অবস্থান বা উঁচু নিচু ও ঠিক করা হয়। যত নীচু তত তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও সম্পদও কম। বিভিন্ন বর্ণের বৈবাহিক বা অন্যভাবে মিশ্রণে বা পুণঃমিশ্রণে বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি হয় মনুস্মৃতি তা বন্ধ করে দেয়। ভিন্ন জাতে বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে লাভ জেহাদ একটা অতি পরিচিত শব্দ।

সেখানে এমনকি পরিবারের মাথারা নিজেদের পরিবারের মেয়েকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করে না। এই মনুস্মৃতি মনে করে বর্ণ শংকর সর্বনাশের মূল। ফলে জাতে জাতে মিশ্রণ হল না,জাতপাত রয়েই গেল। আজও যেকোন খবরের কাগজে পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপনে জাতের উল্লেখ থাকে। মুষ্ঠিমেয় কয়েকটা ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহের কথা উল্লেখ তাকলেও নিচু জাতের সঙ্গে মাঝারি স্তরের জাতের বিবাহ বিশেষ একটা দেখা যায় না।

মনুস্মৃতি অনুযায়ী উচ্চবর্ণের মহিলার সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের মিলন অন্যায়। শূদ্র পুরুষ ও ব্রাম্ভন মহিলার মিলন হলে সন্তান হয় চন্ডাল যা অত্যন্ত নিম্নজাত। এদের স্পর্শ করাও পাপ। শূদ্র পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারীর মিলনে সৃষ্ট সন্তান অস্পৃশ্য বা এখন যাদের দলিত বলে চিনি। এরা তপশিলি জাতির মধ্যে পড়ে। রোমিলা থাপার মতে সমাজে শূদ্রদের নীচে অনেক ধরণের মানুষ ছিল যারা ঘৃণিত বা হীন জাত। সমাজের অতি নোংরা কাজগুলি তাদের দিয়ে করানো হত। মাথায় গামলা করে মল বয়ে নিয়ে যাওয়া, আগেকার দিনে খাটা পায়খানা পরিষ্কার করা তো ছিলই। সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের বাইরে তাদের বাস করার অধিকার দেওয়া হত। এখনও বহু শহরে মেথরপাড়া, ডোমপাড়ার অস্তিত্ব দেখেছি। মনুস্মৃতি অনুযায়ী শূদ্রদের কর্তব্য হল বাকি তিন বর্ণের সেবা করা। দলিতেরা অবশ্য সরাসরি সেবা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মুচি ডোম এদের মধ্যে পরে। এদের ওপরের স্তরে ছিল আজকের ওবিসি কিছুটা ওপরের স্তরের যারা অস্পৃশ্য ছিল না। দলিতরা ঘৃণিত,তাদের সম্পদ ছিল না উপরন্তু সামাজিক উৎপীড়নের শিকার হত উচ্চবর্ণের দ্বারা। খুন, ধর্ষণ ছিল জলভাত। আজও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তা প্রকট। হারস কান্ডের মত অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে নিত্যদিন। গত দশ বছরে তা বেড়েছে প্রবলভাবে।ন্যাশানাল ক্রাইম বুরোর রিপোর্ট তাই বলে। ওবিসি রা তার অনেকটাই থেকে মুক্ত।

আদিবাসীদের বিষয়টা একেবারে আলাদা। তারা নিজেরাই সমাজ থেকে বিচ্যুত। বনে জঙ্গলে তাদের বাস। আধুনিক নগর সভ্যতা তাদের স্পর্শ করত না। স্বেচ্ছায় নিজেদের জনজাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। এরা হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি থেকে আলাদা একটি ধর্মের উপাসক। নিজেরাই নিজেদের খাওয়া পরার সংস্থান করার ফলে চাষবাসই একমাত্র পথ।ফলে তাদের সম্পদও কম। তারা শিক্ষায় পেছিয়ে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী তারা সম্পদ রাখতে পারবে না, শিক্ষালাভ করতেও পারবে না। এরাই আজকের তপশিলি উপজাতি। নেহেরুর নীতিতে এরা বর্তমানে সমাজের উচ্চস্তরে ও পদে জাতগণনা হলে এই সমস্যা দূর হবে। তার কারণ হল মন্ডল কমিশন অল্প কিছু স্যাম্পেল নিয়ে কাজ করেছিল বলে জানা গেছে। সেন্সসে প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে সমীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনী বা ওবিসিরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষায় খুব একটা ভাল জায়গায় নেই। তাই যদি জনগণনার সাথে জাতগণনা করা যায় তাহলে বোঝা যাবে কোন জাত অন্যের থেকে এগিয়ে গিয়ে থাকলে তাদের ওবিসি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। সুযোগ সুবিধা থেকেও। আবার উল্টোদিকে কোন জাত পেছিয়ে পরলে তাকে ওবিসি তালিকায় এনে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাবে।

২০১১ সালে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার জাতিগণনা করে। সামাজিক অর্থনৈতিক জাতগণনা করতে প্রায় ৪৯০০ কোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু তার রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। এটা ঠিক এই রিপোর্ট প্রকাশ হতে কখনও কখনও চার পাঁচ বছর লেগে যায়। কিন্তু ১৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কেন বর্তমান সরকার তা চেপে রেখেছে? আসলে দেশের বিভিন্ন জাতের মানুষ কি অবস্থায় আছে তা জনগণের সামনে আনতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু সরকার তো জানে কোন জাত এগিয়ে বা পেছিয়ে।তার ভিত্তিতে সরকার বা বিজেপি গোপনে অপকর্ম করতেই পারে , কারণ তাদের হাতেই রয়েছে জাত ভিত্তিক তথ্য। একজাতের সাথে অন্য জাতের লড়াই লাগানো তাদের পুরানো ফর্মুলা। সিদ্ধহস্তও বটে। এইভাবেই তো সমাজে বিভেদসৃষ্টির মাধ্যমে তারা সর্বক্ষেত্রে অযোগ্যতা ও অপদার্থতা সত্ত্বেও ক্ষমতায় থাকতে চায়।

নাগরিক স্মৃতিচারণা

শুভ জন্মদিন

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)

তিনি

হুমায়ূন আহমেদ

রাত ন'টার মত বাজে। আমি কি যেন লিখছি হঠাৎ আমার মেজো মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বাবা একজন খুব বিখ্যাত মানুষ তোমাকে টেলিফোন করেছেন।

আমি দেখলাম আমার মেয়ের মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বিখ্যাত মানুষরা যে আমাকে একেবারেই টেলিফোন করেন না তাতো না। মেয়ে এত উত্তেজিত কেন?

'বাবা তুমি কিন্তু আবার আমাকে বলতে বলবে না যে তুমি বাসায় নেই। তোমার বিশ্রী অভ্যাস আছে বাসায় থেকেও বল বাসায় নেই।'

আমি বললাম, টেলিফোন কে করেছে মা?

আমার মেয়ে ফিসফিস করে বলল, জাহানারা ইমাম।

এই নাম ফিসফিস করে বলছ কেন? ফিসফিস করার কি হল?'

'বাবা তিনি যখন বললেন, তার নাম জাহানারা ইমাম তখন আমি এতই নার্ভাস হয়ে গেছি যে, তাকে স্লামালিকুম বলতে ভুলে গেছি।'

' বিরাট ভুল হয়েছে। যাই হোক দেখা যাক কি করা যায়।'

আমি টেলিফোন ধরলাম এবং বললাম, 'আমার মেয়ে আপনাকে সালাম দিতে ভুলে গেছে এই জন্যে সে খুব লজ্জিত। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ওপাশ থেকে তার হাসির শধ শুনলাম। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে টেলিফোন করেছি কিছু কঠিন কথা বলার জন্যে।'

'বলুন।'

'আপনি রাগ করুন বা না করুন কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে।' 'আমি শংকিত হয়ে আপনার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আপনি স্বাধীনতাবিরোধীদের পত্রিকায় লেখেন কেন? আপনার মত আরো অনেকেই এই কাজটি করে। কিন্তু আপনি কেন করবেন?'

তিনি কথা বলছেন নিচু গলায়, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে কোন অস্পষ্টতা নেই। কোন আড়ষ্টতা নেই।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আক্রমণ এইদিক থেকে আসবে ভাবিনি। তবে পত্রিকায় লেখা দেয়ার ব্যাপারে আমার কিছু যুক্তি আছে। খুব যে দুর্বল যুক্তি তাও না। যুক্তিগুলো তাকে শোনালাম। মনে হল এতে তিনি আরো রেগে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, 'আপনার মিসির আলী বিষয়ক রচনা আমি কিছু কিছু পড়েছি, আপনি যুক্তি ভাল দেবেন তা জানি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে যুক্তি শুনতে চাচ্ছি না। আপনাকে কথা দিতে হবে ওদের পত্রিকায় লিখে ওদের হাত শক্তিশালী করবেন না। আপনি একজন শহীদ পিতার পুত্র। 'তুই রাজাকার' শ্লোগান আপনার কলম থেকে বের হয়েছে। বলুন আর লিখবেন না।'

আমি সহজে প্রভাবিত হই না। সে রাতে হলাম। বলতে বাধ্য হলাম, আপনাকে কথা দিচ্ছি আর লিখব না। এখন বলুন আপনার রাগ কি কমেছে?

তিনি হেসে ফেললেন। বাচ্চা মেয়েদের একধরনের হাসি আছে কুটকুট হাসি, বড়দের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে যে হাসিটা তারা হাসে সেই হাসি।

আমি বললাম, 'আমি সবসময় লক্ষ্য করেছি আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলেন। নিজেকে খুব দূরের মানুষ মনে হয়। দয়া করে আমাকে তুমি করে বলবেন।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা বলব। এখন থেকে বলব।'

তিনি কিন্তু আমাকে 'তুমি' কখনই বলেননি। যতবারই মনে করিয়ে দিয়েছি ততবারই বলছেন, 'হ্যাঁ এখন থেকে বলব।' কিন্তু বলার সময় বলেছেন 'আপনি'। হয়তো আমাকে তিনি কখনোই কাছের মানুষ মনে করেননি।

তার অনেক কাছের মানুষ ছিল আমার মা। আমার ছোট ভাই জাফর ইকবাল। জাফর ইকবালের উল্লেখ তার লেখাতে পাই। ব্যক্তিগত আলাপেও জাফর ইকবালের প্রসঙ্গে তাকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখি।

শুধু আমার ব্যাপারেই এক ধরনের শীতলতা। হয়তো তার ধারণা হয়েছিল যে মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন আমি সেই আন্দোলন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। যে ১০১ জনকে নিয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আদি যাত্রা, আমি সেই ১০১ জনের একজন। অথচ পরবর্তীতে আমার আর কোন খোঁজ নেই। কাজেই আমার ভূমিকায় অস্পষ্টতাতো আছেই। তিনি আমার প্রতি শীতল ভাব পোষণ করতেই পারেন। সেটাই স্বাভাবিক।

আরেক দিনের কথা, তিনি টেলিফোন করেছেন। গলার স্বর অস্পষ্ট। কথা কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনার শরীর কি খারাপ করেছে?'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'শরীর আছে শরীরের মতই। আপনাকে একটা ব্যাপারে টেলিফোন করেছি।'

'বলুন কি ব্যাপার।'

'এই যে একটা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমাকে চলতে হচ্ছে মানুষের চাঁদায়। আপনি প্রতিমাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবেন।'

'অবশ্যই দেব'।

'আমি একজনকে পাঠাচ্ছি। এ মাসের চাঁদা দিয়ে দিন।'

'জ্বি আচ্ছা। কত করে দেব?'

আপনি আপনার সামর্থ্য মত দেবেন। মাসে দু'হাজার করে দিতে পারবেন?'

'পারব।'

একজন এসে চাঁদা নিয়ে গেল। পরের দু'মাস কেউ চাঁদা নিতে এলো না। আমার একটু মন খারাপ হল। মনে হল হয়ত সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার কাছ থেকে চাঁদ নেয়া হবে না। তৃতীয় মাসে তিনি টেলিফোন করে বললেন, 'কি ব্যাপার, আপনি আপনার চাঁদার টাকা দিচ্ছেন না কেন?'

আমি বিনীতভাবে বললাম, 'কেউতো নিতে আসেনি।'

'আমার এত লোকজন কোথায় যে পাঠাব। আপনি নিজে এসে দিয়ে যেতে পারেন না? আপনিতো এলিফ্যান্ট রোডেই থাকেন। দু'মিনিটের পথ।'

'আমি আসছি। ভাল কথা আপনার সঙ্গে রাগারাগি করার মত একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি এসেই কিন্তু রাগারাগি করব।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এসে নেই তারপর বুঝবেন।'

'না এখনই বলুন।'

'আমার বড় মেয়ে নোভার ছিল মাথাভর্তি চুল। আপনি হচ্ছেন তার আদর্শ। আপনার মাথার ছোট ছোট চুল তার খুব পছন্দ। সে আপনার মত হবার প্রথম ধাপ হিসেবে তার মাথার সব চুল কেটে ফেলেছে।'

'সত্যি?'

'বাসায় আসুন। বাসায় এসে দেখে যান।'

একেবারে কিশোরী গলায় তিনি অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনার মেয়েকে বলবেন লম্বা চুল আমার খুব প্রিয়। আমি যখন ওর বয়েসী ছিলাম তখন আমার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। ছবি আছে আমি আপনার মেয়েকে ছবি দেখাব। চুল কেটে ছোট করতে হয়েছে ক্যান্সারের জন্যে। কেমোথেরাপির কারণে চুল পড়ে যাচ্ছিল কি আর করব?

তিনি একবার আমার বাসায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবেন। তার গল্প করতে ইচ্ছা করছে। গাড়ি পাঠিয়ে তাকে আনালাম। বাসায় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। গ্রহ

যেমন সূর্যকে ঘিরে রাখে আমার মেয়েরাও তাকে সেইভাবে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল। তিনি তাদের বলতে লাগলেন, তার শৈশবের কথা। আমি আসরে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনি আসবেন না। এই আসরে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।

অন্যান্য ফ্লাটে খবর চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা আসছে। তারাও গল্প শুনতে চায়।

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অতি সম্মানিত এই মানুষটিকে সে কি খাওয়াবে? তিনি তো কিছুই খেতে পারেন না।

তিনি আমার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন, শুধুমুখে যাবেন না। কিছু খাবেন। পাকা পেঁপে থাকলে ভাল হয়।

ঘরে পাকা পেঁপে নেই। আমি ছুটলাম পাকা পেঁপের সন্ধানে। লিফট থেকে নামতেই এক ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন, জানেন, আমাদের এই ফ্ল্যাটের কোন এক বাড়িতে জাহানারা ইমাম এসেছেন।

আনন্দে আমার মন দ্রবীভূত হল। এই মহীয়সী নারী কত অল্প সময়ে মানুষের হৃদয় দখল করে নিয়েছেন।

তার মৃত্যু সংবাদ আমাকে দেন আসাদুজ্জামান নূর।

বাসায় তখন ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে। আমার মেয়েরা জন ডেনভারের গান শুনছে, 'রকি মাউন্টেন হাই, কলারাডো।' সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমার মা আমার কাছে জানতে চাইলেন, আন্দোলন এখন কে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমি তাঁকে বললাম, দ্বিতীয় জাহানারা ইমাম আমাদের নেই। জাহানারা ইমাম দু'টা তিনটা করে জন্মায় না। একটাই জন্মায়। তবে কেউ না কেউ এগিয়ে আসবেই। অপেক্ষা করুন।

মা জায়নামাজে বসলেন।

আর আমি একা একা বসে রইলাম বারান্দায়। এক ধরনের শূন্যতা বোধ আমার ভেতর জমা হতে থাকল। কেবলি মনে হতে লাগল একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এই মানুষটির প্রতি আমার ছিল তা তাকে জানানো হয়নি। আমার একটাই সান্ত্বনা মৃত্যুর ওপাশের জগৎ থেকে আজ তিনি নিশ্চয়ই আমার বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনুভব করতে পারছেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি সবসময়ই তার পাশে ছিলাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকব তাই থাকব। বঙ্গ-জননীর পাশে তার সন্তানরা থাকবে না তা কি কখনো হয়?

বাংলার পবিত্র মাটিতে তার পায়ের চিহ্ন আর পড়বে না। স্বাধীনতাবিরোধীদের এই সংবাদে উল্লসিত হবার কিছু নেই। বাংলার হৃদয়ে তিনি জ্বেলে দিয়েছেন অনির্বাণ শিখা। ঝড়-ঝাপ্টা যত প্রচণ্ডই হোক না কেন সেই শিখা জ্বলতে থাকবে। কী সৌভাগ্য আমাদের তিনি জন্মেছিলেন এই দেশে।

জঙ্গি সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের শান্তি মিছিল

প্রসেনজিৎ দত্ত

গত ১৩ মে,মঙ্গলবার কলকাতায় ১০ টি বামপন্থী দল- এর আহ্বানে যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে,শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে বিরাট মিছিল হয়। সিপিআই (এম), সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআই(এমএল)লিবারেশন, এসইউসিআই(সি), আরসিপিআই, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, ওয়ার্কার্স পার্টি, বলশেভিক পার্টি এই দশটি দল যুগ্মভাবে এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল। ধর্মতলার লেনিনমূর্তির সামনে থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মিছিল শুরু হয়। শেষ হয় শিয়ালদহ স্টেশনের পাশে।

পোস্টারে ব্যানারে সুসজ্জিত মিছিলে তুলে ধরা হয় মানবতার কথা। একদিকে শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বলা মানুষদের উপর নানা ধরনের আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে অন্যদিকে যারা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই প্রশ্ন উত্থাপন করেই বামপন্থী নেতৃত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কে সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন বৈদেশিক শত্রু ও সন্ত্রাসবাদীদের দোসরের ভূমিকা নিয়েছে দেশের ভিতরের কিছু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো শক্তি। তাদের বিরুদ্ধে দেশের সরকার নিশ্চুপ,নেওয়া হচ্ছে না কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ।

এই মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন বামফ্রন্টের সভাপতি প্রবীণ নেতা বিমান বসু,সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিআই-র রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জী, সিপিআই (এমএল) লিবারেশন নেতা কার্তিক পাল, জয়তু দেশমুখ, এসইউসিআই(সি) নেতা চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা রতন ভট্টাচার্য, আরএসপি নেতা দেবাশীষ মুখার্জি সহ বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্ব।

মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মহম্মদ সেলিম বলেন পহেলগ্রামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কলকাতায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে আমরা মিছিল করেছি। আমরা গোড়া থেকেই একথা বলেছি যে দেশ যখন আক্রান্ত তখন সবার আগে প্রয়োজন দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা, একতাই আমাদের শক্তি।নইলে সীমান্ত পারের শত্রুরা সুযোগ নেবে। বিদেশ সচিবও পরে বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক হানাহানি সৃষ্টি করা।আর এস এস মিডিয়া কে ব্যবহার করে যুদ্ধ উন্মাদনা জাগিয়ে দেশবাসীকে অন্য পাঠ দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ঐক্য ও শান্তির কথা কে ঘৃণিত বলে প্রচার করেছে,সোস্যাল মিডিয়ায় নিহত নৌ অফিসারের স্ত্রী ও বিদেশ সচিবের কন্যাদেরও ট্রোল করেছে। প্রধানমন্ত্রী এদের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ। ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ফেক নিউজ ছড়ানো মিডিয়ার বিরুদ্ধে। এ রাজ্যেও শান্তির পক্ষে থাকা মানুষ কে নানা ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যের সরকার নীরব।

মোদী সরকারের কাছে জবাবদিহি চেয়ে সেলিম আরও বলেন,সন্ত্রাসবাদ কে রোখার কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিলেন মোদী, জাতীয় নিরাপত্তা কেন বিঘ্নিত হলো তার জবাব তো তাকেই দিতে হবে।

সভার সভাপতি বিমান বসু বলেন,আমরা বলি দুনিয়ার মজদুর এক হও। ওরা মজুর কৃষকদের ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে চায়,এর থেকে সতর্ক থাকতে হবে। স্বপন ব্যানার্জী বলেন যারা যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করছেন তারাই আসল দেশদ্রোহী। চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটায় না। সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ চায়, দেশবাসীরা নয়। বামপন্থীরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। বক্তারা বলেন--

পহেলগামের ঘটনার পর সর্বদলীয় সভায় সমস্ত রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একমত হয়েছিলেন,কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই সভায় উপস্থিত না থেকে বিহারে নির্বাচনী প্রচার করতে চলে যান।

এর আগের দিন ১২ এপ্রিল অন্যান্য কিছু বামপন্থী দল ও গণ সংগঠন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে মিছিল করে জ্জ শান্তিপূর্ণ এই মিছিলের ওপর বিজেপির নেতা সজল ঘোষের নেতৃত্বে কিছু ব্যক্তি পোড়া মবিল ও ডিজেল ছুঁড়ে আক্রমণ করে ! আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ হামলাকারিদের না ধরে শান্তিপূর্ণ মিছিলকারিদের গ্রেপ্তার করে 'তীব্র প্রতিবাদের পর পুলিশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে সাময়িক ভাবে আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেয় ' এখন প্রশ্ন উঠেছে বিজেপি যদি এতই শান্তির বিরুদ্ধে তাহলে তারা একটু সাহস সঞ্চয় করে মার্কিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান জ্জ সাহস কত বোঝা যাবে।

শিক্ষকদের অমানুষিক লাঠিপেটা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকেরা গত ১৫ মে বিকাশ ভবন ঘেরাও করবেন, তা আগেই ঘোষণা করা ছিল। বিকাশ ভবনে সরকারি নানা বিভাগের কয়েক হাজার কর্মী,অফিসার কাজ করেন। প্রশ্ন উঠেছে, এ তথ্য কি পুলিশের কাছে ছিল না? পুলিশ তো জানত যে বিক্ষোভ হবে। সকালে অফিসে ঢুকে কর্মীদের অনেকেই এ দিন রাত পর্যন্ত আটকে পড়েন। আটকে পড়েন এইসব অফিসে নানা কাজে যাওয়া মানুষজনও। অথচ, বিকাশ ভবনের সামনে এ দিন কয়েকশো পুলিশকর্মী ও অফিসার হাজির ছিলেন। সকাল থেকে ধুন্দুমার শুরু হলেও চুপ করে থাকতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। সন্ধ্যা নামার পরে পুলিশ তার কাজ শুরু করে।

এর আগে চাকরিহারা শিক্ষকদের ডিআই অফিস অভিযানে বেধড়ক মারধর করা হয়। কসবার অফিসের সামনে বিক্ষোভকারীদের সরাতে বলপ্রয়োগ করেছিল পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিককে দেখা গিয়েছিল চাকরিহারা শিক্ষককে লাথি মারতে। তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো প্রকাশ করে বলপ্রয়োগের কারণ ব্যাখ্যা করেছিল।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসির ২৫,৭৩৫ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে হবে কমিশনকে। অভিযোগ, এর ফলে অনেক 'যোগ্য' শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরও চাকরি গিয়েছে। তাঁরাই আন্দোলনে নেমেছেন। মামলাটি এখনও বিচারাধীন। আদালত পরে জানায়, 'যোগ্য' শিক্ষকেরা চলতি মরসুমে স্কুলে যেতে পারবেন এবং বেতন পাবেন। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের কিন্তু পয়লা জানুয়ারির পরে তাঁদের আবার নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে তার পুরনো চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য। স্বভাবতই যোগ্য চাকরিহারারা নতুন করে পরীক্ষায় বসতে রাজি নন। সেই দাবিতেই বিকাশ ভবন ঘেরাও।

কয়েক হাজার শিক্ষক,শিক্ষিকা, কর্মচ্যুত চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা যে ঘেরাও করতে আসছেন, তা তো জানা ছিল পুলিশের। প্রশ্ন উঠেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত চাকরিহারা 'যোগ্য'রা যখন পাঁচিল টপকে ও গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েন, তখন কেন পুলিশের সক্রিয়তা দেখা যায়নি? বিকেল পাঁচটা বাজতেই বিকাশ ভবনের কর্মীরা বেরোতে গিয়ে দেখেন সমস্ত গেট বন্ধ। বাইরে হুলস্থুল অবস্থা। সন্ধে হতেই এই কর্মীদের উদ্ধারে বিকাশ ভবনের তিনদিকের গেট খুলতে উদ্যোগী হয় পুলিশ। ততক্ষণে বহু মানুষ জড়ো হয়েছেন সেখানে। উপস্থিত মিডিয়া। এমনি সরাতে না পেরে অবরোধ হটাতে আচমকাই পুলিশ নির্বিচারে লাঠিচার্জ শুরু করে। আহত ও রক্তাক্ত হন আন্দোলনকারীরা।

সল্টলেক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অনীশ সরকারের কাছে আন্দোলনরত 'যোগ্য' শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জের বিষয়ে জানতে চাইলে, তিনি নিরুত্তর ছিলেন। পুলিশ সরকারি কর্মীদের উদ্ধারে ব্যর্থ হলে, তাঁদের অনেকেই পাঁচিল, লোহার গ্রিল টপকাতে গিয়ে নীচে পড়ে চোট পান। সাধারণ পুলিশকর্মীদের প্রশ্ন, কেন সন্ধ্যার পরে তাঁদের সক্রিয় হতে নির্দেশ দেওয়া হলো! লাঠিচার্জের বদলে 'যোগ্য'দের ঘেরাও,অবরোধ হটাতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করল না কেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

হঠাৎ করে বিনা দোষে চাকরি চলে যাওয়ায় ফের তাঁদের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে রাজপথে। শিক্ষকদের লাঠিপেটা আর গলাধাক্কা দেওয়াই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাও রুজু করেছে পুলিশ। বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায়, আন্দোলনকারী চাকরিহারা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে বিধাননগর কমিশনারেট। সরকারি কাজে বাধা, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, পুলিশকে মারধর, সরকারি কর্মচারীদের আটকে রাখা, আক্রমণ চালানো, এমন একাধিক ধারায় বিধাননগর উত্তর থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

চাকরিহারাদের তরফে মেহবুব মণ্ডল, চিন্ময় মণ্ডলেরা জানান, তাঁরা নতুন করে পরীক্ষায় বসবেন না। তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতক্ষণ না এসে তাঁদের আশ্বস্ত করছেন, ততক্ষণ বিকাশ ভবনের বাইরে অবস্থান চলবে। বেরোতে দেওয়া হবে না কর্মীদের। তবে তাঁদের খাবার আটকানো হবে না।

বেলার দিকে তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত বিকাশ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছোয়। চাকরিহারাদের কয়েক জন তাঁর দিকে ধেয়ে যান। তাঁকে ধাক্কাও মারা হয় বলে অভিযোগ। 'চোর, চোর' স্লোগান ওঠে। সব্যসাচীর গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েন কেউ কেউ। তাঁকে ভিড়ের মধ্য থেকে বার করে নিয়ে যেতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। তবে পুলিশের চেয়েও অধিক সক্রিয় ছিল সব্যসাচীর অনুগত তৃণমূল ক্যাডাররা। 'লাল চুল কানে দুল' ক্যাডাররা হেলমেট এবং লাঠি নিয়ে শিক্ষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেধড়ক মারধর করে। পরে সব্যসাচী বলেন, ''আমি নিজের কাজে এসেছিলাম। আমি কিছু জানি না। পুলিশ আমায় ঢুকতে বারণ করেছে। ওঁরা এটা আবেগে করছেন। রাজ্য সরকার যা করার করছে। আমরা আদালতের ঊর্ধ্বে নই। আদালত যা বলেছে, তা-ই করছি।'' অনেকের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশকে প্রয়োজনে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন পুলিশের নাগাল পাওয়া যায়নি মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জে দাঙ্গা এবং লুটপাটের সময়। সেখানে অবাধেখুন এবং লুটপাট চালাতে দিয়েছে পুলিশ। আর বিকাশ ভবনের সামনে কতগুলো নিরস্ত্র অসহায় মুখ্যমন্ত্রীর দোষেই চাকরিহারা শিক্ষকদের মারধর করে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য পুলিশের অতি সক্রিয়কার ঘাটতি ছিল না।

সুপ্রিম কোর্টের রাজ্য সরকারকে আগে বকেয়া মেটানোর নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের রায়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ২০০৯ সাল থেকে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার শতকরা পঞ্চাশ (৫০) ভাগ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন রাজ্য সরকারের পক্ষে তাদের শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। মনু সিংভি বলেন এই বকেয়া দিতে গেলে রাজ্য সরকারের এখনই ২০০০০ (কুড়ি) হাজার টাকা লাগবে ও সরকারের Back bone ভেঙে যাবে। বিচারপতি সঞ্জয় কারোল বলেন গত ১৪ মে শুনানির দিন আমরা মৌখিক আদেশেই বলে দিয়েছিলাম বকেয়া পাওনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দিতে হবে। মনু সিংভি তখন আবারসোমবারউনিশ মে শুনানির জন্য আবেদন করেন। বিচারক কারোল বলেন তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ভালো করে দেখেছেন। এখনই আর শুনানির প্রয়োজন নেই। মনু সিংভি বলেন রাজ্য সরকার এখন বকেয়া অর্থের শতকরা ১০ ভাগ অর্থ দিতেপারবেন। বিচারকরা বলেন এই নিয়ে আর কথার দরকার নেই । ২০০৫ সালের ROPAকে ভিত্তি ধরে ২০০৯ সাল থেকে প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার শতকরা ২৫ ভাগ আগামী ১ মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে।

২০০৯ সাল থেকে যে মহার্ঘ্য ভাতা বকেয়া ছিল তার দাবিতেআন্দোলন করারকোনও সুযোগ ছিল না। রাজ্য সরকারের চরম দমন পীড়নের নীতির জন্য কর্মচারীরা দিশেহারা ১ বিচারের জন্য কনফেডারেশন অফস্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ State Administrative Tribunal এ মামলা করেন। পরে কনফেডারেশন. এর সঙ্গে যোগ দেয় ইউনিটি ফোরাম ও কর্মচারী পরিষদ এবং ৫জন ব্যক্তি। তাঁরাই এই মামলার রেসপন্ডেন্ট । SAT একটি চূড়ান্ত নেগেটিভ রায় দিয়ে বলে D.A বা মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া বা না দেওয়াটা রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন। D.A কর্মচারীদের কোনও আইনগত অধিকার নয়।

SAT এর এই রায়ের বিরুদ্ধে কনফেডারেশন ও অন্যান্য রেসপন্ডেন্টরা এই রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে ২০১৭ সালের ১৪ ই মার্চ সংবিধানের ২২৬ নম্বর ধারায় মামলা করেন। মাননীয় বিচারপতি নিশীথা মাত্রে ও মাননীয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে (W.P.S.T no ৪৫/২০১৭)। দুর্ভাগ্য ,শুনানি শেষ হয়েরায় দানের সম্ভাবনার মধ্যেঅবসর গ্রহণজনিত সময়াভাবের কথাবলেরায় দিলেন না ।

তবে মাননীয় বিচারপতি নিশীথা মাত্রে। তাঁর বেঞ্চ যে ভাবে একের পর এক কর্মী অনুকুল পর্যবেক্ষণ দিয়ে এসেছেন, সরকারকে ১৫% ডি.এ. ঘোষণা করতে বাধ্য করেছেন, তাতে তাঁর বেঞ্চ কেন অপ্রত্যাশিতভাবে রায় দিলেন না , তা আজও অজানা।

মামলা গেল মাননীয় বিচারপতি দেবাশিষ করগুপ্ত এবং শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চে। আদালতের নিয়মে আবার শূন্য থেকে মামলা শুরু হল। আগের বেঞ্চের সওয়াল-জবাব, পর্যবেক্ষণ— সব জলেগেল। এই পর্বে কনফেডারেশন মামলায় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে যুক্ত করার সিদ্ধান্তনেয়। সে জন্য একটি সংগঠন/এক জন ব্যক্তি প্রয়োজনাকোন সংগঠন AddParty হতে রাজি হলেন না. অবশেষেঅর্থ দপ্তরের কর্মী (প্রয়াত) স্বপন দে এগিয়ে এলেন. তাঁরআইনজীবী হিসাবেই বিকাশবাবু, ফিরদৌস শামিম, গোপা বিশ্বাসরা মামলায় আইনজীবী হিসাবে যুক্ত হলেন। তখন সরকার 'বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ফোবিয়া'য় আক্রান্ত। এ.জি.র তীব্র আপত্তিতে আটকে গেল স্বপন দের মামলায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন। ৭ টি শুনানির পর সর্দার আমজাদ আলি ও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের যুক্তি মেনে স্বপন

দে কে মামলায় যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন মাননীয় বিচারপতিরা। মামলায় এলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

তারপরেরটা ইতিহাস। হাইকোর্টে রিভিউ পিটিশনসহ ৬ টি জয় কর্মীপক্ষের। ৩১ আগষ্ট,২০১৮ মাননীয় বিচারপতি দেবাশীষ করগুপ্ত ও শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিলেন -- "D.A.is a legally enforceable right of the employees." পরবর্তীতে মাননীয় বিচারপতি হরিশট্যান্ডন ও রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চরায় দিলেন,"DA is a legally enforceable fundamental right of the employees." এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এস.এল.পি.দাখিল করেন রাজ্য সরকার।

এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এস.এল.পি.দাখিল করেন রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে Respondent রা ২ টি গুরুত্বপূর্ন পর্যবেক্ষণ পেয়েছেন—'(১)'২০১৮ সালের রায়। সেই রায়েরউপর একইবেঞ্চের কাছে একাধিক রিভিউ পিটিশন দাখিল করেরাজ্য সরকার নিজেই রায়টিকে legality দিয়ে দিয়েছেন। রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে কোনও চ্যালেঞ্জ মামলা করেননি। এতদিন পরেকেন এস.এল.পি. ?

'(২)' প্রশ্ন উঠেছেকেন রাজ্যের এস.এল.পি.খারিজ করা হবে না? 'স্বাভাবিক ভাবেই মামলার চূড়ান্তরায়যে অনুকুল হবে. সে সম্পর্কে Respondent রা যথেষ্ট আশাবাদী ও আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ করেছেন। DA মামলা নিয়ে শ্যামল মিত্র'র সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছি। ২০১৬ সাল থেকে তাঁদের অর্থাৎ Confederation এর সঙ্গে যোগাযোগ। ওঁরা ছোট সংঘ, কিন্তু সাহসের কোনও সীমা পরিসীমা নেই । শ্যামল মিত্র ও মলয় মুখার্জি, ওঁদের এই দুই জনাকে সরকার সারা রাজ্যে বদলি করে ঘুরিয়েছে। ওঁদের নামে নারী নির্যাতনের Case দিয়েছে তাও ওঁরা নতিস্বীকার করেননি।

কাছারের ভাষাআন্দোলন ও কলকাতায় উনিশে মে

নীতীশ বিশ্বাস

প্রাথমিক উচ্চারণ :

আসামের বাইরে ভারতে ও বাংলা ভাষী বিশ্বে আমরা অনেকেই জানতাম না ভারতে বাংলা ভাষার-শহিদ দিবস ১৯শে মে'র কথা। যদিও প্রায় সকলেই জানি বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা। আর জানিনা বা মনে করি না মানভূমের, মানভূম ভাষা-আন্দোলনের কথা। যে আন্দোলনের পথে পুরুলিয়া জেলার বাংলায় পুনর্ভূক্তি ঘটে। এর জন্য দীর্ঘ আন্দোলনের কথাও আমাদের অর্ধ জানা। অন্যদিকে ১৯শে মে শিলচরে অহিংস-অসযোগ আন্দোলনে একদিনে ১১ জন শহিদের দৃষ্টান্ত পৃথিবীরকোথাও, কোনও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নেই। আমরা তাই সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের পক্ষ থেকে ভারতে বাংলা ভাষা দিবস হিসেবে সেই ১৯শে মে পালনের ডাক দিয়েছি। অবশ্যই ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তার আগের দিন ২০শে ফেব্রুয়ারিকে আমরা পালন করি ভারতে ভাষা-গণতন্ত্র দিবস হিসেবে এবং পশ্চিম বঙ্গের মাতৃভাষা দিবস হল ১লা নভেম্বর মানভূম ভাষা আন্দোলনের বিজয় দিবস। এই ডাক সকলের ডাক হোক এই আবেদন আমাদের ।

আন্দোলন সমকালে আসামের কথা :

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তৎকালীন আসামে বাঙালি একক-বৃহৎ ভাষা-জনগোষ্ঠী ছিল । সঠিক তথ্যটি পরিসংখ্যান ঘটিত। কিন্তু আসামে ১৯৮১ সালের সেন্সাস করা হয়নি, ১৯৭১ সালের তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে। সে-অনুসারে বরাক উপত্যকার যে ভাষিক চিত্রটি ফুটে ওঠে, তা নিম্নরূপ :-

বরাক উপত্যকার মোট জনসংখ্যা১৭,৪৩,৪০০ (সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশ) বঙ্গভাষী-১৩,৩২,২০০ জন , অসমিয়া ভাষী-৬,৮০০,হিন্দিভাষা ভাষী-১,৯৩,২০০, ডিমাসা-৯,২০০বিষ্ণু প্রিয়া মণিপুরী- ৩৩, ০০০; মেইতেই মণিপুরী ৬৮,৪০০জন। দেখা যাচ্ছে বরাক উপত্যকার মোট জনসংখ্যাব. শতকরা ৭৭ ভাগই বঙ্গভাষী। দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন হিন্দি ভাষীরা, এরা মুখ্যত চা-বাগান-শ্রমিক, উনবিংশ শতকের শেষভাগে, অথবা বিশ শতকের প্রথম ভাগে বাগান মালিকেরা এদের আনিয়ে ছিলেন নানাস্থান থেকে। কিন্তু মিশ্র সংস্কৃতির কারণে তারা হিন্দি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। এ ছাড়া ডিমাসা রাজারা এককালে সমতল কাছাড়ে ও রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ হচ্ছে সমতল কাছাড়ের খাসপুরে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে যখন ডিমাসাদের বড় অংশটা সমতলে নেমে আসতে রাজী হননি, তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে রয়ে গেলেন। সেই পার্বত্য কাছাড় এখন উত্তর-কাছাড় পার্বত্য জেলা নামে পরিচিত এবং সেটাকে বরাক উপত্যকার মধ্যে ধরা হয় না। ঐ পার্বত্য অঞ্চলে ডিমাসাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। যাইহোক বরাক উপত্যকায় যে স্বল্প সংখ্যক ডিমাসা রাজার সঙ্গে পারিষদ ও কর্মচারী হিসাবে নেমে এসেছিলেন, এদের আগমনের তারিখ হচ্ছে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও মেইতেই মণিপুরী (দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা) দের যে লাখ খানেক লোক বরাক উপত্যকায় রয়েছেন, তাঁরা এসেছেন মণিপুরের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও পরবর্তী বর্মী আক্রমণের ফলে। বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের আগমনের সময়সীমা হচ্ছে ১৭৭০-১৮২৬ সাল। যে ছ'হাজার অসমিয়া এ উপত্যকায় বাস করেন, তার মধ্যে হাজার খানেক হচ্ছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষ, বদলির চাকরীর সূত্রে অস্থায়ীভাবে এখানে আছেন। বাকি পাঁচ হাজার বরাক উপত্যকারই কয়েকটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা যখন বারবার বর্মী আক্রমণের ধাক্কায় শ্মশান হয়ে যাচ্ছিল,

তখন এরা ভয়ে পালিয়ে এসে এই বসতিগুলি গড়েতোলেন। সেটাও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। এর থেকে দেখা যাচ্ছে এখন বরাক উপত্যকার এই যে সমস্ত ভাষিকগোষ্ঠী বসবাস করছেন, তারা সকলেই অষ্টাদশবা ঊনবিংশশতকে এসেছেন।

বরাক উপত্যকাব. আজকের অধিবাসীরা সকলেই রহিরাগত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, এ-উপত্যকায় বাঙালিরা কবে থেকে বসতি বিস্তার শুরু করেন। এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের সীমাহীন অপ প্রচারের মুখে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নের যথার্থউত্তরটি সকলেরই জেনে নেওয়া দরকার। দেখ যাবে বরাক উপত্যকাব . আজকের বাসিন্দা অন্যকোন ভাষিক গোষ্ঠীই যেক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের আগে এ উপত্যকায় আসেননি, সে ক্ষেত্রে এ-উপত্যকায় বাঙালিদের বসতি স্থাপন শুরু হয়েছিলবহুআগে আররাজ্য পুনর্গঠন কমিশন আসামকে মুখ্যত দ্বি-ভাষিকঘোষণা করলেও মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা সব জেনেশুনেই ১৯৬১সালে বিদ্যালয় স্তর সহ সমস্ত শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে একমাত্র অসমিয়াকে সরকারী ঘোষণাদেন।

এই ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৬১ সালে ১৯শে মে আসামের বাঙালি-প্রধান বরাক উপত্যকায় অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। সেই শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের আসাম সরকারের পুলিশ ও সি আর পি নির্বিচারে লাঠি চার্য করে ও গুলি চালায়। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দীসহ সর্বত্র এই ঘটনা ঘটে।যারফলে একমাত্র শিলচর স্টেশানে পুলিশের গুলিতে ১১জন বাংলাভাষা প্রেমী শহিদহন ।তারা হলেন-- (১) কমলা ভট্টাচার্য, (২) চণ্ডীচরণ সূত্রধর, (৩) কুমুদরঞ্জন দাস, (৪) কানাইলাল নিয়োগী, (৫) সুনীল সরকার, (৬) তরণী দেবনাথ, (৭) শচীন্দ্রপাল, (৮) সুকোমল পুরকায়স্থ, (৯) হিতেশ বিশ্বাস (১০) সত্যেন্দ্র দেব ও (১১) বীরেন্দ্র সূত্রধর । কমলা ভাষার জন্য প্রাণদান করা প্রথম মহিলা শহীদ।

এরপরেও নতুন নতুন আক্রমণে ১৯৭২ সালের ১৭ই আগষ্ট এই আন্দোলনের ধারা-প্রবাহে করিমগঞ্জে প্রাণ দিয়েছেন ডিওয়াই এফ (DYFI) এর বিজন চক্রবর্তী (বাচ্চু), ১৯৮৬সালের ২১শে জুলাই প্রাণদেন দিব্যেন্দু দাস ও জগন্ময় দেব। পরে ১৯৯৫এর ৩১শে ডিসেম্বর প্রাণ দেন মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা ভাষী জে এন ইউ ফেরত উজ্জ্বল ছাত্র ও তরুণ প্রতিভা সলিল সিংহ ও আর ১৯৯৬ সালের ১৬ই মার্চ শহিদ হন তরুণ যুবতী মাতৃভাষা সংগ্রামী সুদেষ্ণা সিংহ ।

এই আত্মদান ব্যর্থ হয়নি, আমরা কাগজে-কলমে বরাকে পেয়েছি দ্বিতীয় রাজ্য-ভাষার মর্যাদা। যদিও আজ নানা কৌশলে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভাষিকভাবে নির্যাতিত আসামের অনসমিয়ারা বিশেষ করে বাংলা ভাষীরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ।

মেধাবী ছাত্রী সৃজনীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাবার মতো বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে গবেষণা করতে আগ্রহী সৃজনী বলেন, তিনি নিজেকে কখনও সাধারণ অধ্যয়নশীল ধরণের মানুষ হিসেবে দেখেননি। পশ্চিমবঙ্গের ISC টপার সৃজনী, যিনি ৪০০-এর মধ্যে ৪০০ নম্বর পেয়েছেন, তিনি পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ার সময় নিজের পদবী ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে ভেদাভেদমুক্ত সমাজের প্রতি তার বিশ্বাস থেকেই এই সিদ্ধান্ত এসেছে।

দক্ষিণ কলকাতার ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের ছাত্রী তার সকল বিষয়ে নিখুঁত ১০০ নম্বর অর্জন করেছেন। তীব্র শিক্ষাজীবনের সময়সূচী সত্ত্বেও, তিনি আরজি কর মেডিকেল ছাত্রীকে ধর্ষণ-হত্যার পর ১৪ আগস্ট উইমেন রিক্লেইম দ্য নাইট আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সময় বের করেছিলেন। 'একজন ব্যক্তি হিসেবে, এটা আমার সিদ্ধান্ত ছিল-আমার বাবা-মা এবং বোনের সমর্থনে। আমি এমন একটি সমাজে বিশ্বাস করিয়া জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বাইরেও বিভাজনের ঊর্ধ্বে ওঠে। আমার কাছে, পদবী কোন ব্যাপার না। আমি সবসময় আমার বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের কাছে আমার প্রথম নাম দিয়ে পরিচিত। পদবির বোঝা বহন করার কারণ কী? আমি ভাগ্যবান যে, আমার পরিবারের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছি,' টালিগঞ্জ এলাকার রানীকুঠির বাসিন্দা সৃজনী বলেন। 'পড়াশোনার সময় ব্যতীত, আমি সবসময় আমার বাবা-মা, বোন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে আড্ডার জন্য সময় বের করতাম,' তিনি বলেন। ধর্ম সম্পর্কে তারঅবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি আরও বলেন, 'আমি আবেদনপত্রে ধর্মের স্লটে 'মানবতাবাদ' লিখেছিলাম।'

ফিউচার ফাউন্ডেশন, রিজেন্ট পার্কের একজন কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, 'কোনও প্রার্থী যদি তার পদবী ত্যাগ করতে চান তবে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। এটি পুরোপুরি আইনের মধ্যে রয়েছে।'

সৃজনীর বাবা দেবাশিস গোস্বামী, একজন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট অধ্যাপক এবং শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত, এবং মা গোপা মুখার্জি গুরুদাস কলেজের সহকারী অধ্যাপক। মেয়ের কৃতিত্বের পাশাপাশি তার নীতি এবং মূল্যবোধের জন্য দ্বিগুণ গর্বিত।

'আমার দুই মেয়েই জন্ম থেকেই আমাদের দেওয়া মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে অন্তরে গেঁথে নিয়েছে। আমি নিজেও আমার স্বামীর পদবী ব্যবহার করি না। যখন আমরা আমাদের মেয়েদের জন্ম সনদের জন্য আবেদন করি, তখন আমরা কোনও পদবী অন্তর্ভুক্ত করিনি। আমরা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখি যা পুরুষতন্ত্র এবং উগ্রতাবাদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত,' মিসেস মুখার্জি বলেন।

ধর্মবর্ণ নিয়ে এই হানাহানির যুগে সৃজনীর মতো মনোভাব সত্যিই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।